উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

এপ্রিল ২০২১। মূল্য ২০ টাকা

# এখন ডুয়ার্স

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

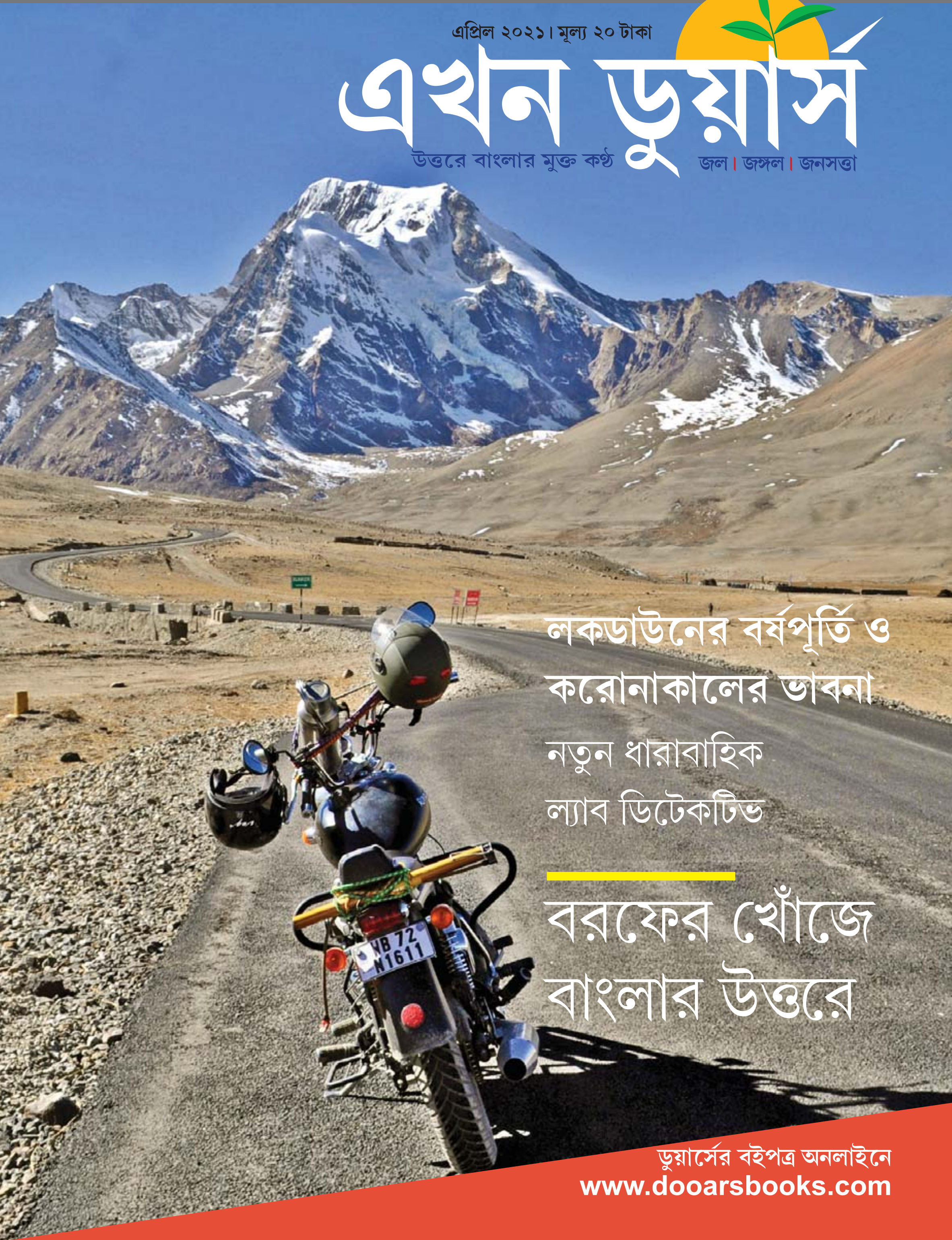

## লকডাউনের বর্ষপূর্তি ও করোনাকালের ভাবনা

নতুন ধারাবাহিক

ল্যাব ডিটেকটিভ

## বরফের খোঁজে বাংলার উত্তরে

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

# এখন ডুয়ার্স

অষ্টম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২১

**সম্পাদনা ও প্রকাশনা**
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

**সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা**
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

**সহকারী সম্পাদনা**
শ্বেতা সরখেল

**বিন্যাস**
শান্তনু সরকার

**সার্কুলেশন**
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

**মুদ্রণ** অ্যালবাট্রস

**ইমেল**
ekhonduars@yahoo.com

**সম্পাদকীয় দপ্তর** সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

**প্রচ্ছদ** নীলাঞ্জন মিস্ত্রী



এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।



**সম্পাদকের চিঠি ৩**

**লকডাউনের বর্ষপূর্তি। বিশেষ প্রতিবেদন**
আমাদের আলিঙ্গন কি হারিয়ে যাবে? ৫

**করোনাকাল। ফিরে দেখা**
মনে কি রেখেছি মহামারীতে মহোত্তম মানবসেবকদের মৃত্যু নেই? ১০
উত্তর খুঁজবে এবার ‘করোনা-উত্তর’ উত্তরবঙ্গ! ১৩
সেমিকোলন না অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স? ১৬
চিন্তা করানোর কোনও পরিষেবা মিলবে কি? ১৮

**রাজনগরের রাজনীতি**
ক্ষমতাসীন সিপিএমের নরমেধ তাণ্ডবে কংগ্রেসী রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল আশির দশক ২০

**ধারাবাহিক প্রতিবেদন**
গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি ২৪

**ভোটকর্মীর রোমন্থন**
ভোট এলেই মনে পড়ে প্রথম ভোটের সেই দিনটি ২৮

**মুর্শিদাবাদ মেইল**
মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৪

**পর্যটন**
বাইকে বরফের খোঁজে উত্তরে ৩৭

**ধারাবাহিক উপন্যাস**। ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৪৪

**অলৌকিক কাহিনি**। তন্ত্র ৫৪

**ল্যাব ডিটেকটিভ ৫৭**

**আমচরিত কথা**। ভক্ত বা ভক্তি বিষয়ক ৬৫

**ডুয়ার্স ইত্যাদি**। হরেক মাল দশ টাকা ৭৯

**শ্রীমতি ডুয়ার্স**
বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ভারতীয় নারী। আন্না মনি ৬৯
পুরাণের নারী কৃকল পত্নী সুকলা ৭৪
পাতাবাহার ৭৬
প্রবাসী কন্যার মেয়েবেলা ৭৮

# একুশের অমোঘ ডাক ও উত্তরের প্রতিধ্বনি

সত্তর বছর পেরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী তর্কপ্রিয় উদারপন্থী এই বঙ্গ রাজ্যে সপ্তদশ বিধানসভা গঠনের লক্ষ্যে জনাদেশ গ্রহণের পালা শুরু হয়েছে। তার চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বে উত্তরবাংলার মানুষ তাদের 'কিমতি' গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। কোভিডের বৎসর ভর শীতলতা কাটিয়ে এই নির্বাচন বাংলার বুকে যথেষ্ট উষ্ণতা ছড়িয়েছে সন্দেহ নেই। যুযুধান সব ক'টি দলই ব্রিগেড ময়দানে তাদের পেশীবলের প্রদর্শনী করে দিয়েছে। জমজমাট বাজারে জোরকদমে তর্জা চলেছে চায়ের দোকানে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চলেছে মিম ট্রোলের মিছিল, নিউজ চ্যানেলের শীতল কক্ষে কোট-টাই পরিহিত কর্মীরা নানান জার্সির মাতব্বরেদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আর বাংলার 'কৌলীন্য' বজায় রেখে রাজনৈতিক খুন নির্বাচনী আসর গরম করছে।

রঙ্গে ভরা এই বঙ্গে ভোটের লড়াই নিয়ে ব্যঙ্গ তামাশা চললেও মানুষ কিন্তু এখন সকালে চায়ের সঙ্গে বা দুপুরে ভাতের সঙ্গে আর সব ছেড়ে ভোটই ভেজে খাচ্ছে। কিন্তু নিজের বা সন্তানের ভবিষ্যৎ আগামীকাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে খুব একটা ফিকির নেই কারুরই। যেন সবাই ধরেই নিয়েছি উচ্চশিক্ষা চিকিৎসা বা কাজের প্রয়োজন হলে অনন্যোপায় হয়ে এ রাজ্যের বাইরে যেতেই হবে, বাংলার এই ভবিতব্য খণ্ডাবার আর কেউ নেই। বাংলার মেধা-শ্রম-মানব সম্পদকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনা হবে— ঠিক দশ বছর আগে ক্ষমতায় আসার আগে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি যে কতটা ভাঁওতা ছিল তা আজ অতীব প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তারা আজও চল্লিশ শতাংশের বেশি ভোট পাবে দাবি করে যখন আমরা তর্কের আসর জমাই তখন সত্যি ধন্দে পড়ে যাই নির্লজ্জ আসলে কারা? রাজনীতির নেতারা? নাকি আমরা নিজেরাই?

আর নেই রাজ্যের বাসিন্দা এই উত্তরবাংলার কথা আলাদা করে নাই বা বললাম। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উদযাপনের তোড়জোড় চলেছে অথচ রাজ্যসভায় কিংবা রাজ্য ক্যাবিনেটে উত্তরবাংলা থেকে জনপ্রতিনিধিত্বে আনুপাতিক বৈষম্য নিয়ে আজ পর্যন্ত সোচ্চার হয় নি কোনও দল। ফলে আজও উত্তরবঙ্গের বাহাত্তরটি নদীর সংকট নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই, পর্যটনের প্রসার নিয়ে কোনও পলিসি নেই, চায়ের সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে তুলবার কোনও প্যাকেজ নেই, আম-কমলা-আনারস কিংবা বাঁশ-পাট জাত ক্ষুদ্র শিল্প নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেই, বালুরঘাট-মালদা -জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে এয়ারপোর্ট থেকেও নেই, এইমস নেই, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, লোকসংস্কৃতি অ্যাকাডেমি নেই...। নেই-এর তালিকা বাড়িয়ে আজ আর হৃদয় ভারি করবার ইচ্ছে নেই, আমরা এই নেইতেই বড় স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছি এখন।

তাই আজও নির্বিবাদে ভোট হয়, অশুভ জোট হয়, সেকুলারের মুখোশ পড়ে ধর্মের ঘোঁট হয়। সেদিনের তরতাজা যুবা আজ যখন বার্ধক্যে পৌঁছে তার পুরনো সব অপমান জ্বালা বেমালুম ভুলে গিয়ে জাতশত্রুর হাত শক্ত করার ডাক দেয় কোনও এক গোপন বাসনায়, তখন ফের প্রশ্ন জাগে প্রকৃত নির্লজ্জ কারা? বিদগ্ধ ওঁরা? নাকি হতভাগ্য আমরা?

এই একটা বছরে কোভিড মানুষের পুরনো ভাবনা হিসেব নিকেশ সব আদ্যন্ত বদলে দিয়েছে। পুরনো মুখ, পুরনো বাতেলা, পুরনো স্লোগান সবটাই আজকাল অসাড় অচল মনে হয়। একুশ সাল কমন ম্যানের জীবনে নতুন আলোক রেখা আনলেও আনতে পারে, এমন সম্ভাবনা উজ্জ্বল, সেরকমই বলছেন কেউ কেউ। যদি সত্যিই তাই হয় তবে সেই অমোঘ ডাকের প্রতিধ্বনি আলবত মিলবে উত্তরবাংলা থেকেও। আগামী দিনগুলিতে বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ হবে এই উত্তর থেকেই— এইটুকু জোর গলায় বলতে পারি।

**প্রদোষ রঞ্জন সাহা**

# বন্ধুদের অপেক্ষায় ভালোবাসার বইঘর

## প্রকাশিত হল

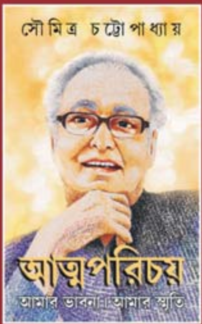


সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

**আত্মপরিচয়** 395/-

'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ ক্বচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার

সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে

**হায় সজনি**

চূড়ান্ত রোম্যান্টিক উপন্যাস 199/-

## এখনও যেসব বই বেস্টসেলার!

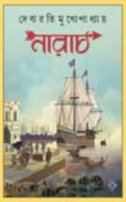

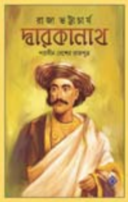

সুন্দরী সিরিজের শ্রেষ্ঠ বই! ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত **সোমনাথ সুন্দরী** 395/-

উনবিংশ শতাব্দীর মর্মস্পর্শী দলিল! অন্ধকারে আলোর মশাল

দেবারতি মুখোপাধ্যায় **নারাচ** 385/-

তিনি ছাড়া ঠাকুর পরিবার শিকড়হীন! পরাধীন দেশের রাজপুত্র

রাজা ভট্টাচার্য **দ্বারকানাথ** 349/-

তন্ত্র-অলৌকিক-অপবিজ্ঞানের গায়ে কাঁটা দেওয়া বই

অভীক সরকার **পেতবত্থু** 199/-

অন্যজগতের অতিথিদের অব্যক্ত কথা!

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় **ছায়া আছে কায়া নেই** 249/-

**বইসাঁকোর নতুন বই**

হুমায়ূন আহমেদ

**নন্দিত নরকে** 120/-

**শঙ্খনীল কারাগার** 135/-

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

**গোপন প্রেম** 175/-

**মৃত্যুকে আমি দেখেছি** 199/-

**শেষ ছোবল** 160/-

যোলোজনের কলমে
ভয়াল ভূতুড়ে উপন্যাস
ভূমিকা **অনীশ দেব**

প্রকাশ আসন্ন

**পানিঝোরা কটেজ**

**পত্রভারতী** 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 700 009
ফোন 22411175, 9433075550

বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি

নতুন বই ও ক্যাটালগের জন্য bookspatrabharati.com

**উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান:** ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, **হোম ডেলিভারি** ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

# আমাদের আলিঙ্গন কি হারিয়ে যাবে?

সুমন ভট্টাচার্য

'কেয়ামত সে কেয়ামত তক।'

আশির দশকে যে সুপারহিট সিনেমা দিয়ে আমির খান বলিউডে জায়গা পাকা করে নিয়েছিলেন, সেই সিনেমার নামটাই আসলে করোনার বর্ষপূর্তিতে সবচেয়ে বড় এবং উপযোগী ক্যাচলাইন। ২০২০-র মার্চটা যদি শুরু হয়ে থাকে একটা অজানা আতঙ্ক এবং তীব্র ভয় দিয়ে, তাহলে ২০২১-ও দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের উপর। সেই ধ্বংসস্তূপ অর্থনৈতিক হাহাকার এবং অবিশ্বাসের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি গত ১০০ বছরের ইতিহাসে মানব জাতির শরীরে এবং মনে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে থাকে এবং গোটা বিশ্বের মানচিত্র এবং অর্থনীতিকে বদলের কাজ করে থাকে, তাহলে করোনা বা কোভিড-১৯ আজকের পৃথিবীকে কতটা বদলে দিল, তা নিয়ে হয়ত আগামী অর্ধ শতাব্দী ধরে চর্চা চলবে। একাডেমিক স্তরে কিছু গবেষণা হবে, সামাজিক এবং মানসিকতার দিক থেকে আমাদের কী কী পরিবর্তন হল, তা হয়ত বুঝতে আরও একটা গোটা শতাব্দীই লেগে যাবে।

হয়ত মঙ্গলে যখন নিয়মিত যান চলাচল করবে এবং বুদ্ধিমান প্রোমোটাররা সেখানকার ফ্ল্যাট বিক্রি করবে, তখন চর্চায় থাকবে বাসস্থান হিসাবে পৃথিবীকে, আমাদের এই সবুজ শ্যামল ধরিত্রীকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য করোনার কতটা অবদান ছিল।

বামপন্থী সমাজতত্ত্ববিদ রেমন্ড উইলিয়ামস তাত্ত্বিক এবং বিশ্লেষণের দিক থেকে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর 'কী ওয়ার্ডস' বইটিকে নিয়ে চিরকালই বেশি আলোড়ন হয়, কারণ উইলিয়ামস ধরে ধরে দেখিয়েছিলেন আজকে আমরা যে শব্দগুলি ব্যবহার করি, মানে ইংরাজি ভাষায় যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তার মূল উৎপত্তি কোথায়, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে সেই শব্দগুলি বদলেছে। রেমন্ড উইলিয়ামসের কাজটি যেহেতু বহু আলোচিত এবং পরবর্তীকালে আরও অনেক যশস্বী ভাষাবিদ বা চিন্তাবিদ তাঁর দেখানো পথে হেঁটে শব্দের আদি মানে এবং বর্তমানে আমরা যে অর্থে প্রয়োগ করি, তার তফাৎকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন, সে জন্য আমরা বুঝতে পারি যুদ্ধ আমাদের শব্দচয়ন এবং শব্দের মানেকে কীভাবে বদলে দিয়েছে। তেমনই করোনাও কীভাবে আমাদের শব্দচয়ন এবং নিত্যদিনের ব্যবহারকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছে, তা নিয়েও হয়ত ভবিষ্যতে গবেষণা হবে। অর্থাৎ যেটাকে আগে ধরা হত 'সিকিউরিটি থ্রেট' বা নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ, কেউ কেন নিজের নাক থেকে মুখ পর্যন্ত ঢেকে রাখবে, তাহলে তো আমি তাঁকে চিনতে পারব না, আজকের পৃথিবীতে সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বিমান এবং ট্রেন তো বটেই, এমনকী আজকাল লিফটে উঠতেও মাস্ক পড়া অপরিহার্য।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতাকে একটা ভয়াবহ ঝাঁকুনি দিয়ে গিয়েছিল। সেটা যতটা বীভৎসতা, ততটাই অর্থনৈতিক দিক থেকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বোধহয় মানুষের মনে। সিনেমা হিসাবে 'হিরোসিমা মনাআঁমুর' যদি একটা প্রান্তিক উদাহরণ হয়, তাহলে আলব্যেয়ার কামু, ফ্রান্স কাফকা বা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সাহিত্য তার আর একটি দিকের কথা বলে। গভীর হতাশাবোধ, জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়া এবং নির্লিপ্ততা, যেগুলি পরের ৭৫ বছরে মনোবিজ্ঞানী এবং মনোবিদদের জন্য সবচেয়ে পরিচিত শব্দ হয়ে যাবে, সেগুলি যে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে শুরু করেছে, তাই তিন কালজয়ী লেখকের সাহিত্য কীর্তি বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে হেমিংওয়ে যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী পৃথিবী একেবারেই আগাপাশতলা আমাদের চিনিয়েছিলেন। কারণ, তিনি নিজে যুদ্ধে সৈনিক ছিলেন, পরবর্তীতে সাংবাদিক হয়েছিলেন এবং তারপরে সাহিত্যিক হিসাবে অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন একটা যুদ্ধ আসলে আমাদের মনে কী গভীর ক্ষত রেখে যায়। হেমিংওয়ে কিংবা কামু তাঁদের শৈল্পিক দক্ষতায় মানুষের নিঃসঙ্গতা, যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির অস্তিত্বের সঙ্কটকে যেভাবে ধরেছিলেন, সেটাই পরের কয়েক যুগ ধরে চর্চার বিষয় হয়ে থেকেছে। 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' নামে একটি শব্দ, যা এই করোনাকালে সবচেয়ে ব্যবহৃত শব্দ, আসলে আমাদের মধ্যে, মানুষে মানুষের মধ্যে কতটা ব্যবধান তৈরি করতে পারল, সেটা হয়ত পৃথিবীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় বা গবেষণায় ধরা পড়বে না। ঠিক যেমন জানা যাবে না বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এবং হয়ত ভারতবর্ষ কিয়দংশে হলেও 'আনটাচেবিলিটি'র সেই ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, এই করোনা কাল, 'সামাজিক দূরত্ব' মানার ক্রমাগত হুঁশিয়ারি আবার অস্পৃশ্যতাকে কতটা ফিরিয়ে আনল। আগামী পয়লা বৈশাখ কতজন হৃদয়কে হৃদয়ের পাশে রেখে কোলাকুলি বা আলিঙ্গন করবেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নিতেও কেউ পিছিয়ে যাবেন না তো?

আমাদের মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু গোটা বিশ্বকে এইভাবে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি। যা এর আগে অবধি আধুনিক মানব সভ্যতার উপরে সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল, তাও এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত বিমানবন্দরকে বন্ধ, সমস্ত যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন এবং অর্থনীতিকে একেবারে শিকল পড়িয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু ২০২০-র করোনা কাল ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছিল। 'নিউইয়র্ক টাইমস' বা 'ওয়াশিংটন

পোস্ট' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কখনই এইভাবে গণ কবর খুড়ে মানুষকে শুইয়ে দিতে হয় নি। কিন্তু এই শেষ বিদায়ের ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং করোনা কালের মধ্যে একটা ভয়ংকর তফাৎ ছিল। যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের প্রিয়জনরা শেষবারের মত তাঁর কপালে হাত রাখা কিংবা হাতে একটা আলতো চুমু তো দূরের কথা, শেষ যাত্রায় শরিক পর্যন্ত হতে পারেন নি। মার্কিনী সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর যে কী গভীর প্রভাব সামাজিক জীবনে এবং আমেরিকার মননে পড়েছে, তা বুঝতে হয়ত কয়েক দশক লেগে যাবে। তার সঙ্গে যদি আমাদের দেশের উদাহরণ টানা যায় তাহলে দেখব, চেন্নাইতে কবর দেওয়ার সময় আক্রান্ত হতে হয়েছে, এমনকি খাস পশ্চিমবঙ্গেও করোনা আক্রান্তের দেহ পোড়ানো বা কবর দেওয়া নিয়ে বিস্তর অশান্তি, এলাকায় উত্তেজনা, শেষকৃত্য করতে আসা পুরসভার কর্মীদের তাড়া, সব দৃশ্যের মন্তাজ এবং কোলাজ আমরা দেখতে পেয়েছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দুই প্রান্তে দুটো উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলাম, অর্থাৎ একদিকে 'হিরোসিমা মনাআঁমুর' এবং অন্যদিকে কামু, কাফকা ও হেমিংওয়ের সাহিত্য, করোনা কালকেও কি সেইরকম দুটি প্রান্তিকতা দিয়ে ধরা সম্ভব? যদি ধরতে হয়, এবং যদি ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে দুটি 'এক্সট্রিম'কে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে একদিকে লাখো লাখো পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, তাঁদের ঘরে ফেরার আকুতি এবং মৃত্যুকে ধরলে পরে তার বিপরীতে থাকবে আদানি গ্রুপের কর্ণধর গৌতম আদানির বাৎসরিক সম্পদ বৃদ্ধি। এমনিতে সব পরিসংখ্যানই বলছে, করোনা কালে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং গরিবরা আরও গরিব। সেটা সব দেশের ক্ষেত্রেই সত্যি। আমেরিকাতেও অ্যামাজন কর্তা জেফ বেজোর বা টেসলা-র কর্তা এলন মাস্কের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানই বলছে, করোনা কালে এই দুই মার্কিন ধনকুবেরের সম্পদ যেভাবে বেড়েছে, ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানির সম্পদ বৃদ্ধির হার তার চাইতে বেশি। এটা আর কিছু প্রমাণ করে না, শুধু প্রমাণ করে ভারতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্যের অভাব কতটা প্রকট এবং কতটা তীব্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনার আগেই 'অক্সফ্রাম'-এর মত সংস্থা সমীক্ষা করে বলেছিল, পৃথিবীর মোট সম্পদের বেশিরভাগটাই তার জনসংখ্যার দুই শতাংশের হাতে আছে। বাকিরা উপেক্ষিত এবং অবহেলিত।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আর একটু স্পষ্ট হতে পারে। এই করোনা কালে প্রায় সব সংস্থা কর্মী ছাটাই করেছে, কিংবা ব্যয় সংকোচের পথে হেঁটেছে। কিন্তু কর্মী ছাটাই এবং 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' এর দৌলতে অনেক সংস্থায় বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি খরচ যতটা কমিয়েছে, লাভের অঙ্কও ততটাই

**বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এবং হয়ত ভারতবর্ষ কিয়দংশে হলেও 'আনটাচেবিলিটি'র সেই ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, এই করোনা কাল, 'সামাজিক দূরত্ব' মানার ক্রমাগত হুঁশিয়ারি আবার অস্পৃশ্যতাকে কতটা ফিরিয়ে আনল। আগামী পয়লা বৈশাখ কতজন হৃদয়কে হৃদয়ের পাশে রেখে কোলাকুলি বা আলিঙ্গন করবেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নিতেও কেউ পিছিয়ে যাবেন না তো?**

বেড়েছে। সেটা এমনকি ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা টিসিএস কিংবা ইনফোসিসের ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে সত্যি। তাহলে মোদ্দা কথা কী দাঁড়াল? মালিক বা শিল্পপতির পকেট ভরেছে, কিন্তু সাধারণ কর্মীদের চাকরি গেছে। অর্থাৎ কিনা শুধু পরিযায়ী শ্রমিক, যারা আমাদের অর্থনীতির তলার দিকের অংশ, তাদের উপরেই চাপ পড়েছে এমন নয়, মধ্যবিত্ত, অর্থাৎ যাঁরা সমাজের মাঝের স্তরে আছে, তাঁদের উপরেও তীব্র আঘাত এসেছে। এটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যতটা সত্যি, আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মত, বিশ্বের উন্নত

অর্থনীতিগুলির ক্ষেত্রেও ততটাই বাস্তব। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে যেহেতু সামাজিক সুরক্ষা আছে, অর্থাৎ আপনার চাকরি গেলে সরকার আপনাকে ভাতা দেবে, তাই সেখানকার অর্থনীতির উপর ধাক্কাটা একরকম, কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে, ১৩০ কোটি মানুষের দেশে চাকরি চলে গেলে কোনওরকম সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তাই শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে করোনা ভারতবর্ষের সংকট তৈরি করে নি, সামাজিক এবং মানবিক দিক থেকেও আমাদের অস্তিত্বকে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকট আমাদের অস্তিত্বতে যে প্রবল ঝাঁকুনিটা দিল, আর করোনাজনিত আতঙ্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বিধির হুঁশিয়ারি আমাদের মননে যে গভীর নিঃসঙ্গতা তৈরি করল, তাই আসলে ২০২১-এর

**বিনোদন আর তাঁদের মাপের 'রোটি কাপড়া মকান'কে নিশ্চিত করছে না বুঝেই তো এই সব 'এন্টারটেইনার'রাও রোজগারের নতুন প্ল্যাটফর্ম বেছে নিলেন। রাজনীতি। যদি পারফর্মেন্সই, থুড়ি অভিনয়, যা এতদিন তাঁদের টাকা দিত, তাহলে 'মানুষের সেবা' করার অভিনয় করলে মন্দ কি?**

সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। বিষয়টা কিরকম? ভারত, রাষ্ট্র হিসাবে, একটা ১৩০ কোটি মানুষের দেশ হিসাবে যতটা ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তার থেকে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু আমাদের সবকিছু নিয়ে গভীর সংশয় তৈরি হল। প্রথমেই আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম কবে ভ্যাকসিন আসবে, কিন্তু তারপরে যখন ভ্যাকসিন এল, সেই টিকা আদৌ কতটা কাজে দেবে, নেওয়া উচিৎ হবে কিনা, নিলে কী কী শারীরিক অসুবিধা হতে পারে, তাই নিয়ে একটা গভীর সংশয় এবং সন্দেহ থাকল জনসংখ্যার একটা বড় অংশের মধ্যে। ভ্যাকসিন নিয়ে এই সংশয় বা সন্দেহের পিছনে আসল কারণটা কি? শুধুই কি এটা, যে অনেকেই মনে করছেন যে আসলে এত তাড়াতাড়ি টিকা আবিষ্কার এবং তৈরি করা সম্ভব নয়? এই গোটা বিষয়টা নিয়ে নিশ্চয়ই আগামী এক দশক ধরে বৈজ্ঞানিকরা এবং সমাজতাত্ত্বিকরা চর্চা করবেন।

আমি নিত্যদিনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় যেটুকু বুঝেছি, আসলে আমাদের মত অনেক সাধারণ নাগরিকেরই 'সিস্টেম' এর উপরে আর কোনও আস্থা নেই। এই 'সিস্টেম' মানে সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, মিডিয়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা সবকিছুই। কারণ করোনা কাল আমাদের শিখিয়েছে টেলিভিশন চ্যানেল টিআরপি বাড়ানোর জন্য আতঙ্ক তৈরি করে, সরকার তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুচারুভাবে ট্রেনে করে ঘরে ফেরাতে পারে না, স্বাস্থ্য পরিষেবা হঠাৎ করেই একেবারে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ কিনা, করোনার মতোই তীব্র সংকটের সময় যা আমার কাজে লাগল না, বরং যা আমাদের অসহায় এবং রিক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিল, তার উপর আমি আস্থা রাখব কী করে?

এই যে 'সিস্টেম' এর প্রতি অনাস্থা বা অভিমান, সমাজের অনেককেই একক ভাবে, হয়ত বা নিঃসঙ্গভাবে যে লড়াইটা লড়তে হয়েছে, তা মননে এবং চিন্তায় গভীরভাবে ছাপ ফেলে গেছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই মানুষের মস্তিস্কে, এবং সেই মানুষ যখন সমষ্টিগতভাবে একটা সমাজ বা জাতি হিসাবে নিজেকে দেখতে চাই, তাঁদের মানসিকতাতেও আমুল পরিবর্তন এনে দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলি যেমন ইতালি বা জার্মানি যদি মাল উৎপাদনের জন্য চিনকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে, ভাবতে থাকে 'আমি তোমাকে এত পণ্যের বরাত দিতাম, আর তুমি আমায় জানালে না যে তোমার দেশে কী মারণ রোগ এসেছে?', তাহলে সেটা চিনের অর্থনীতির জন্য ধাক্কা। আবার মার্কিন জনগণ যদি মনে করে, তাঁদের প্রশাসন, বা তাঁদের প্রেসিডেন্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঠিকমত কাজ করে নি, তবে করোনার পূর্বে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও নির্বাচনে হেরে হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি নিঃসঙ্গতা শব্দটার সঙ্গে, 'ডিপ্রেশন', তা অর্থনৈতিক হোক কিংবা মানসিক,

আমাদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে করোনা আমাদের গভীর সংশয়, সন্দেহ এবং আতঙ্কের এক মনোজগতে রেখে গেল। ১৬৪৮ এর 'ওয়েস্ট ফেলিয়া' চুক্তি যদি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম তারিখ হয়, তাহলে ২০২০-র করোনা কাল রাষ্ট্র এবং সরকারকে সংশয়ের মেঘজালে ঢেকে দিল। আমরা, মানে সাধারণ নাগরিকরা আর কোনও কিছুকে বিশ্বাস করি না। সন্দেহ করি, সংশয়ে থাকি রাষ্ট্র বা সরকারের অভীপ্সা নিয়ে, প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন করি, যা কিছু হচ্ছে, তা আমাকে কতটা নিরাপদে রাখবে। এই নিরাপত্তা অনেকগুলি পর্যায়ের। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, শারীরিক নিরাপত্তা এবং আসলে যেটা অনুচ্চারিত থেকে যায়, সেটাও প্রবলভাবে সত্যি মানসিক নিরাপত্তা। এই যে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সপরিবারে সিনেমা দেখা ছেড়ে পরিবারের সবাই আলাদা আলাদা করে নিজের নিজের মোবাইলে চোখ রাখতে অভ্যস্থ হয়ে গেলাম, সেটাই তো দূরত্ব বাড়ার আর একটা চেহারা মাত্র। এতে হয়ত নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন বা আরও অনেক তথাকথিত ওটিটি প্লাটফর্মের সাবস্ক্রাইবার বা গ্রাহক সংখ্যা কোটিতে বাড়াল, এবং জেফ বেজোসকে অনেকটা ধনী করল, কিন্তু 'মাস এন্টারটেইনার'দের কী হল? বিনোদন আর তাঁদের মাপের 'রোটি কাপড়া মকান'কে নিশ্চিত করছে না বুঝেই তো এই সব 'এন্টারটেইনার'রাও রোজগারের নতুন প্লাটফর্ম বেছে নিলেন। রাজনীতি। যদি পারফর্মেন্সই, থুড়ি অভিনয়, যা এতদিন তাঁদের টাকা দিত, তাহলে 'মানুষের সেবা' করার অভিনয় করলে মন্দ কি?

গায়ক যথেষ্ট অনুষ্ঠান পাচ্ছেন না, শিল্পী জেলায় জেলায় 'শো' পাচ্ছেন না, রেস্তোরাঁয় লোক হচ্ছে না, পর্যটকরা বেড়াতে যাচ্ছেন না। এই সব কিছু যে অর্থনৈতিক সংকটকে ডেকে আনে, তার থেকে মোকাবিলার উপায় কী? সাধারণ নাগরিকদের এতদিন প্রধান আশা ভরসার জায়গা ছিল রাষ্ট্র বা সরকার। কিন্তু এই করোনা কাল তো সেই আস্থার জায়গাই টলিয়ে দিয়েছে, গভীর সংশয় আর সন্দেহে ঢেকে দিয়েছে সবকিছুকে। তাহলে পরিস্থিতির উন্নতিতে সহায় কী হতে পারে? আমেরিকা বা ইউরোপকে ঘুরে দাঁড়াতে হচ্ছে তার সমাজের উপর নির্ভর করে।

ভারতের ক্ষেত্রেও তার সমাজ, তার তথাকথিত রাষ্ট্র বা সরকারের 'ধারণা'র চাইতে অনেক বেশি পুরনো এবং শক্তিশালী। এই সংকটের গোটা বছরটা দেখিয়ে দিয়েছে আসলে 'সিস্টেম' এর চাইতে সমাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, রাষ্ট্রের চাইতে এতদিন ধরে চলে আসা প্রথা বা মূল্যবোধই বাঁচিয়ে দিতে পারে। ঠেলে তুলতে পারে সভ্যতা নতুন করে যেভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলছে, সেই দিকেও।

ওইজন্যই 'কেয়ামত' শব্দটা দিয়ে শুরু করেছিলাম। 'কেয়ামত' বা ধ্বংসের পরে একটা নতুন করে শুরু থাকে। তার জন্য বাইবেলে বর্ণিত কোনও 'নোয়া' একটা ডিঙি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ার কথা সভ্যতার চিহ্নগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। একটা বেহাল অর্থনীতি এবং তার চাইতেও বিচ্ছিন্ন অন্য সমস্ত মাধ্যমকে আবার স্বভূমিকায় ফিরিয়ে আনার জন্য গোটা বিশ্বই আপাতত ওই ডিঙিতে সওয়ার।

# মনে কি রেখেছি মহামারীতে মহোত্তম মানবসেবকদের মৃত্যু নেই?

**বিপুল দাস**

প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিসের সময় হিপোক্রেটিস নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। পাশচাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বস্তুত, সেই সময়ে তাঁর মত সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষ গ্রীসে খুব কমই ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা এখনও নামটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে। তার প্রধান কারণ শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীদের একটি শপথগ্রহণ করতে হয়। সেটি রচনা করে গেছেন হিপোক্রেটিস। হিপোক্রেটিক ওথ-টেকিং নামক এই অনুষ্ঠানে চিকিৎসক হিসেবে কী কী নিয়ম পালন করা চলা উচিত— সে বিষয়ে নীতি এবং আদর্শগত কিছু বাক্য শপথবাক্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। তবে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। একজন চিকিৎসক হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী অসুস্থ মানুষের সেবা, গোপনীয়তা বজায় রাখা, পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে এই মানব শরীরের রহস্য বিষয়ক গোপন বিদ্যা এবং উপশমের জন্য বিবিধ ওষুধের কার্যকারিতা বুঝিয়ে দেওয়া— মূলত এসব বাক্যই শপথ হিসেবে গ্রহণ করানো হয়।

মনে পড়ে 'ফেরে নাই শুধু একজন' বইটির কথা। ডক্টর দ্বারকানাথ কোটনিশের জীবনের অসাধারণ আখ্যান। ১৯৩৮-এ জাপান চীনকে আক্রমণ করল।

চীন ভারতের কাছে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জন্য চিকিৎসক চাইল। সুভাষ বসুর উদ্যোগে বাইশ হাজার টাকা সংগৃহীত হ'ল। ভারতের পাঁচজন ডাক্তারের একটি টিম একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে রওনা হ'ল। কাজ শেষ করে চারজন ফিরে এলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের অসহায় অবস্থা দেখে একজন ফিরতে পারলেন না। তিনি ডক্টর দ্বারকানাথ কোটনিশ। টানা বাহাত্তর ঘণ্টা ধরেও তিনি অসুস্থ মানুষের সেবা করে গেছেন। পাঁচ বছর ধরে চীনের সব প্রদেশে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করেছেন। ১৯৩৯-এ মাও জে দং-এর নেতৃত্বে এইটথ্ রুট আর্মিতে যোগ দিলেন সীমান্তের ঘাঁটিগুলোতে আহত সেনাদের চিকিৎসার জন্য। ডক্টর কোটনিশ মারা যান ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে। তাঁর এবং ডক্টর নর্ম্যান বেথুনের মূর্তিতে বছরে একদিন ফুলে ফুলে ঢেকে দেয় চীনের কৃতজ্ঞ মানুষ।

মনে পড়ে মোমবাতি হাতে সেই সেবিকার কথা। সর্বজনের শ্রদ্ধেয়া আর্তের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। এমনি কত মহৎ প্রাণ সেবাধর্মে দীক্ষিত হয়ে, সব কিছু তুচ্ছ করে, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলেছে। সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। কত দীর্ঘদিন মানুষ শরীরের অসুস্থতাকে দেবতার অভিশাপ মনে করত। পূজার্চনা, যাগযজ্ঞ করে, মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতাকে খুশি করার চেষ্টা করত। প্রার্থনা করত— সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। কিন্তু মানবদেহের ভেতরের বিভিন্ন তন্ত্র বা সিস্টেম সম্পর্কে বিশদে কোনও ধারণা ছিল না। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মূলাধার চক্র, কুলকুণ্ডলিনি, সহস্রার ইত্যাদি ব্যাখ্যা পরে তন্ত্রসাধনায় যুক্ত হয়। অসুখের কারণ খুঁজে পেতে হলে চাই মানবদেহের তন্ত্র বা সিস্টেম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। স্নায়ুতন্ত্র, পৌস্টিক তন্ত্র, শ্বসন তন্ত্র, রক্ত সংবহন তন্ত্র ইত্যাদি। এসব দূরের কথা, তখনও মানবশরীরের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কেই পরিষ্কার ধারণ ছিল না। দেহ-ব্যবচ্ছেদ ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। আর সেটা সম্ভব একমাত্র মৃতদেহ যদি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায় শরীরের কোথায় কী থাকে। কিন্তু চার্চের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মৃতদেহে অস্ত্রোপচার নিষিদ্ধ। তবু মানুষের অদম্য কৌতূহল, অজানাকে জানার চেষ্টা জয়ী হ'ল। রাতের অন্ধকারে সমাধি খুঁড়ে মৃতদেহ বের করে সেটি ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষানিরীক্ষা চলল। শরীরের কোথায় কী আছে, ধীরে ধীরে জানতে পারছিল কৌতূহলীরা। মানবদেহের রহস্য ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছিল।

এই সময়ে বা তারও অনেক আগের থেকে প্রাচ্যে আয়ুর্বেদ চর্চা উন্নতির শিখরে পৌছেছিল। গ্রীস, মিশর, চীন, ইরান এবং ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। বুদ্ধের সময়কালে জীবক ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু চিকিৎসক। তাঁর গুরু ছিলেন আত্রেয়। কত নাম পাওয়া যায়। ধ্বন্বন্তরী, চরক, সুশ্রুত, চক্রপাণিদত্ত, মাধবকর, সুরেশ্বর, বঙ্গসেন, অগ্নিবেশ, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ভোজ। প্রাণকে

**অসুস্থ হলে আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। প্রাণের মায়া বড় মায়া। তখন গভীর রাতেও ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে হয়। নার্সিং-হোম বা হাসপাতালে ছুটতে হয় নিরাময়ের জন্য। একটু উপশমের জন্য। চেম্বারে গিয়ে যখন উল্টোদিকের চেয়ারে বসা মানুষটাকে দেখি, আপনা হতেই সম্ভ্রম জাগে। মনে হয় ইনিই আমার মুশকিল আসান।**

বাঁচিয়ে রাখার জন্যজ্ঞানের প্রদীপ এক হাত থেকে অন্য হাতে বয়ে চলেছে।

যুগান্তর এল ১৯২৮-এ। ইংল্যান্ডের প্যাডিংটন শহরের সেন্ট মেরি হাসপাতালের পরীক্ষাগারে ডক্টর আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করলেন পেনিচিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক। সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সেটা ছিল এক শুভ দিন।

কথায় বলে শরীরং ব্যাধিমন্দিরম। আমাদের এই শরীরের ভেতরে এবং বাইরে দিনরাত কত খুদে খুদে শত্রুর আনাগোনা। কেউ বায়ুবাহিত, কেউ জলবাহিত। দেহের সজীব কোষকে ধ্বংস করে মানুষের প্রাণ হরণ

করবে বলে তারা ছিদ্র খোঁজে। আমরা প্রতিরক্ষার বর্ম সাজাই। একটা যুদ্ধ শুরু হয়। প্রাণের স্বপক্ষে চিকিৎসক থাকেন লড়াইয়ের সামনে। কত রকমের যুদ্ধ। অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীব মারণ-যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে সংসার জুড়ে। দেহে যত তন্ত্র আছে, তার যে কোনও সিস্টেম যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। অসুস্থ মানুষকে নিয়ে তখন আমাদের দৌড়তে হয় ডাক্তারবাবুর কাছে। মানবদেহের রহস্য কিছুটা তিনি জেনেছেন। এখনও সামান্যই জানা হয়েছে। এখনও ডাক্তারবাবু ছুরিকাঁচি হাতে নিয়ে কপালে ছোঁয়ান। সারা পৃথিবী জুড়ে কত ল্যাবরেটরি। প্রতিমুহূর্তে সেখানে চলছে গবেষণা। কী করে মানুষের শিয়র থেকে মরণকাঠি সরিয়ে জিয়নকাঠি সাজানো যায়। কোন লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে রোগের পরিচয়। কোন ওযুধে জব্দ হবে মারণ বীজাণু। যা ছিল একদিন দেবতার অভিশাপ, মানুষ আজ তার কারণ জেনেছে। তবু মানুষ এখনও কত অসহায়। কত ব্যাধির কাছে নতজানু। কিন্তু এই লড়াই ছেড়ে পিছিয়ে আসে নি। এখনও কত কিছু জানার বাকি রয়ে গেছে। হাজার টেস্ট করেও আপাত কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না অসুস্থতার। একদিন রোগীর মৃত্যু হলে লাঠিসোটা নিয়ে হাসপাতাল ভাঙচুর হয়। শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হন ডাক্তারবাবু। অথচ তাঁর কিছুই করার ছিল না।

ব্যবহারজীবীদের মধ্যে একমাত্র চিকিৎসা পেশায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সময় লাগে প্রতিষ্ঠিত হতে। এমবিবিএস কমপ্লিট করার পর হাউজস্টাফশিপ, ইন্টার্নশিপ। তারপর মাস্টার্স। তারপরেও কেউ আরও উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে পারে। আর যতদিন তিনি মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত, ততদিন তাকে এই বিষয়ে আপ-ডেট থাকতে হবে। কোথায়, কোন জার্নালে কোন অসুখ বিষয়ে নতুন কোন তথ্য প্রকাশিত হল, সেটার খেয়াল রাখা। সেবা পরমধর্ম— এই বাক্য অন্তর থেকে বিশ্বাস করে কাজ করে যাওয়া।

অসুস্থ হলে আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। প্রাণের মায়া বড় মায়া। তখন গভীর রাতেও ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে হয়। নার্সিং-হোম বা হাসপাতালে ছুটতে হয় নিরাময়ের জন্য। একটু উপশমের জন্য। চেম্বারে গিয়ে যখন উল্টোদিকের চেয়ারে বসা মানুষটাকে দেখি, আপনা হতেই সম্ভ্রম জাগে। মনে হয় ইনিই আমার মুশকিল আসান। কঠিন ব্যাধি থেকে জীবন ফিরে পেলে ডাক্তারবাবুকে মনে হয় দেবতা। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাই না। আবার অকৃতজ্ঞ মানুষ প্রবল শোকে, প্রবল আবেগে তাঁকে অপমান করে, নিগৃহীত করে।

হিপোক্রেটিসের নামে যিনি শপথ গ্রহণ করেছেন, তিনি তবু তার ধর্ম থেকে একচুলও সরেন না। তাঁর উৎকণ্ঠা থাকে রোগীর জন্য, তাঁর ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদ বলে কিছু থাকতে নেই, তাঁর দিনরাত বলে কিছু নেই। নাটক, সিনেমা, সামাজিকতার সময় নেই। আছে শুধু যে কোনও মুহূর্তে সংক্রমণের ভয়। যে কোনও মুহূর্তে অপমানিত হওয়ার ভয়। তবু তার মাঝেই চলে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই। তার মাঝেই পড়াশোনা করে নিজেকে সময়োপযোগী রাখা। ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে শেখানো। প্রাণের প্রদীপকে চিরপ্রজ্জ্বলিত রাখবে বলে হাত থেকে হাতে চলতে থাকে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা।

# উত্তর খুঁজবে এবার ‘করোনা-উত্তর’ উত্তরবঙ্গ !

**দেবপ্রসাদ রায়**

১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিক থেকে লিয়েণ্ডার পেজ ব্রোঞ্জ নিয়ে আসবার পর সেইসময় কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের যুগ্ম-সচিব গৌতম গুহকে বলেছিলাম, ‘সাফল্য যেখান থেকে এল, তার জন্য আপনারা কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। কারণ, লন-টেনিস নিয়ে আপনাদের না কোনও গৃহীত নীতি আছে, না কোনও আর্থিক অনুদান অথবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সবটাই খেলোয়াড়দের নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিশ্চিত করতে হয়।’ উনি অস্বীকার করতে পারেন নি, যদিও অস্বস্তি বোধ অবশ্যই করেছিলেন, কারণ সাই-তে রেখে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে যাদের পাঠানো হল তারা সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ তো দূরের কথা, কোয়ার্টার ফাইনাল অবধিও যেতে পারে নি। সরকারি উদ্যোগের ব্যর্থতা ও তার বিপ্রতীপে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাফল্য একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে দেখলে ঘরের পাশেই উদাহরণ পাওয়া যাবে, আর একটা অলিম্পিকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

রাজ্য জুড়ে নব-নির্মিত অব্যবহৃত কিষাণ-মাণ্ডিগুলি, যারা নিত্যনৈম্যত্তিক বিভিন্ন কারণে নানা স্থানে যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিলেন (লকডাউনের আগে) তারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, তবে এখন হয়ত পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফিরে এলে ‘আইসোলেশনে’ রাখার প্রয়োজনে এই পরিকাঠামোগুলো কাজে

লাগতে পারে। লকডাউন দৈনন্দিন জীবন থেকে হয়ত অনেকেরই অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, আবার অফুরন্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করে কেউ কেউ হয়ত অনায়ত্ব কিছু জিনিসকে করায়ত্ব করার চেষ্টা করছে। আমি যেমন লকডাউনের প্রাকমূহূর্তে স্মার্টফোন উপহার পেলাম, প্রথম কদিন খাবি খাচ্ছিলাম, তারপর আমার কাজের ছেলে বিশু (যার এ-ব্যপারে দক্ষতা যে কোন টেকস্যাভি ব্যক্তিকেও ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে) কে ধমকে ধামকে ক্র্যাশ-কোর্স করার মত 'বেসিক'গুলো শিখে নিতে পেরেছিলাম বলে এখন হোয়াটস-অ্যাপ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। ফলে নানা ভিডিও ক্লিপিং দেখবার সুযোগ হচ্ছে, যদিও সকালের আধ ঘণ্টা সময় নিয়ম করে গুড-মর্নিং এর জবাব দিতে চলে যাচ্ছে। ইদানিং চোখে একটু কম দেখছি, অনেক দিন পাওয়ার টেস্ট করি নি - এখন তো উপায়ও নেই— তাই 'ডিপি' দেখে কাউকেই চিনতে না পেরে সবাইকে নিষ্ঠার সাথে জবাব দিই, কারণ কী করে জানব কোন ডিপি-তে কোন প্রতিভা লুকিয়ে আছে!

যাই হোক, গতকাল একটা ভিডিও ক্লিপিং কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। এক বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'করোনা উত্তর' দিনগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্যের চেহারা একদম বদলে যাবে। কিছু ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, আর কিছু নতুন ব্যবসা উঠে আসবে। নতুন নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই, কিন্তু উঠে যাবার তালিকায় পর্যটন দেখে আমি উদ্বিগ্ন। ডুয়ার্সের অর্থনীতি এই মূহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ব্যবসার ওপর এবং সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ কর্মসংস্থানও মূলত এই দুটি ক্ষেত্রেই হয়েছে— পর্যটন ও ছোট চা-বাগান।

ইকো-ট্যুরিজম এর সূত্রপাত লাটাগুড়ি থেকে। এক সময়ের স-মিলের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই ছোট বন্দর এলাকাটি প্রমাদ গুনতে শুরু করল, যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অরণ্য ছেদন বন্ধ হল। কাঠই যদি না আসে তাহলে কাঠের মিল চলবে কী করে! অনেকে জানেন, অপর্ণা সেনের 'মিস্টার এণ্ড মিসেস নায়ার' ছবিটির শুটিং হয়েছিল এই লাটাগুড়িতে। কিন্তু বাতাবাড়ির প্লাইউড ফ্যাক্টরিটি যদি রিসর্টে পরিণত না হত, তাহলে উনি এখানে ঐ পরিকাঠামো না পেলে এক মাসের ওপর এই এলাকায় থেকে ছবি নির্মাণের কর্মকাণ্ড চালাতে পারতেন কিনা, অথবা আদৌ লোকেশন হিসেবে লাটাগুড়ি পছন্দ করতেন কিনা সেই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়।

ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইতে শুরু করলাম। যেটা বলার, তা হল কাঠের ব্যবসা বন্ধ হওয়াতে লাটাগুড়ি নিজেই পর্যটনের ব্যবসার পথ বেছে নিয়েছিল। এবং গরুমারাকে ঘিরে এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে গোটা ডুয়ার্সকে এই 'সানরাইজ' ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে উৎসাহিত করে। আমার জানা তথ্য অনুযায়ী, এই মূহূর্তে লাটাগুড়ি ও তার সন্নিহিত এলাকায় ৬৫টি রিসর্ট বা পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের প্রচেষ্টায় যদিও এখানে আজও একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা একটা পেট্রোল পাম্প নিশ্চিত করা যায় নি, ফলে কোন পর্যটক অসুস্থ হলে ময়নাগুড়ি বা মঙ্গলবাড়ি ছাড়া তার কোনও গতি নেই আর পর্যটনের মরশুমে ৬৩টি জিপসির তেল ভরতেও এই দুই জায়গায় যেতে হয়। তবে ইদানিং পর্যটন দপ্তর নিজেও এখানে— টিলাবাড়িতে, বাতাবাড়িতে - তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক 'ডুয়ার্স মেগা-ট্যুরিজমের' —এর খাতে ৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও প্রথম কিস্তির ২৩ কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা না দিতে পারাতে বাকি ২৩ কোটি টাকা আর পাওয়া যায় নি। গল্প সেটা নয়, গল্প হল, সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে স্ব-উদ্যোগে যে পর্যটন শিল্প ডুয়ার্স জুড়ে গড়ে উঠেছে, তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই শিল্পে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়ে আছে — সেই কাজ হারানো মানুষগুলো কোথায় যাবে ! ভাবতেও ভয় হচ্ছে !

আমরা কেউ কখনও ভেবেছি কি, সারা দেশে এবং এই রাজ্যেরও পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মাওবাদী কার্যকলাপ কেন্দ্রের এবং রাজ্যের রাতের ঘুম একসময় কেড়ে নিলেও ডুয়ার্সের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তার প্রতিফলন ঘটল না কেন ?

দুটো বিশ্ববিদ্যালয় এখন উত্তরবঙ্গের উত্তরভাগকে অ্যাকাডেমিক লিডারশিপ দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত সেখানকার সমাজবিজ্ঞানীরা এই বিষয়টির ওপর কোনও আলোকপাত করেছেন বলে শুনি নি। কিন্তু

একটা গুঞ্জন নয়ের দশকে শুরু হয়েছিল। যাঁরা কান পেতেছেন তাঁরা শুনতে পেয়েছেন। এটা ভুললে চলবে না '৭০'-দশকের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে যে জেলাগুলি সন্ত্রাস কবলিত হওয়ার তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিল, তার ভিতর বীরভূমের পরে জলপাইগুড়ি স্থান করে নিয়েছিল। যারা সেদিন দীক্ষিত হয়েছিলেন ও পরের প্রজন্মকে দীক্ষিত করেছিলেন তারা সব কর্পূরের মত উবে গেলেন— এটা সেই সময়ে রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর মনে করেছেন কিনা জানি না, তবে ডুয়ার্স-অসম সীমান্তে মাঝে মাঝে যে 'এথনিক কনফ্লিক্ট' হয়েছে (সাঁওতাল বনাম বোরো) তার ইন্ধন কে বা কারা জুগিয়েছেন, সে তথ্য প্রমাণসহ দাখিল করবার দায়বদ্ধতা আমার নয়। তবে যে কোনওভাবে রাষ্ট্রশক্তিকে বিব্রত করা যে তাদের অ্যাজেণ্ডার একটি আব্যশিক দায়িত্ব সেটুকু অনুমান করবার জন্য সমাজবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সীমান্ত পেরিয়ে চা-বাগানে পা ফেলতে শুরু করেছিল বলেই পূর্ব-ডুয়ার্সে প্রথম গুঞ্জন শুরু হয়— লোকসভায় ভোট দেব, বিধানসভায় ভোট দেব, আর পঞ্চায়েতে ব্রাত্য থাকব তাহলে আমরা কারা! পঞ্চায়েত এলাকায় ১৮ বছর বয়স হলে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে রেশন বরাদ্দ হবে আর চা-বাগানে ১৮ বছর বয়স হলে রেশনের তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হবে— এই বঞ্চনা সইব কেন? এই পটভূমিতে চা-বাগানে পঞ্চায়েতি রাজ। আর তাই সীমান্ত পেরিয়ে আদিবাসী এলাকায় মাওবাদ এসে পৌঁছবার আগেই সে তার প্রয়োগ শক্তি হারিয়ে ফেলে।

পশ্চিমাঞ্চল এখন শান্ত। দশ হাজার আদিবাসী যুবক সিভিক পুলিশের চাকরি পেয়েছে। নয়াগড়, বেলপাহাড়িতে আজ আর বাতাসে বারুদের গন্ধ নেই, আর নতুন করে কোনও আমলাশোলের গল্প আর আমাদের শুনতে হয় না। ডুয়ার্সের বাতাসেও আজ বারুদের গন্ধ নেই, জীবন সিংয়ের অনুগামীদের অধিকাংশই আজ মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। জানি না, তাদের ভেতর কতজন আজ সিভিক পুলিশের চাকরি করছে। তবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্যের পূর্বতন সরকার বা বর্তমান সরকার কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বলে কেউ কখনও শোনে নি।

যখন কে.এল.ও নামটাই হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল তখন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সুব্বাইয়া সাহেব কেন্দ্র থেকে তিন বছরের জন্য বি.আর.জি.এফ. (ব্যাকোয়ার্ড রিজিয়ন গ্র্যান্ট ফাণ্ড) খাতে ১৫ কোটি টাকা করে ৪৫ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। দুটি প্রকল্প শুরু করেছিলেন— নবদিশা ও নবজ্যোতি। নবদিশা আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে, আর নবজ্যোতি গ্রামীণ স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনে— বি.আর.জি.এফ. এর ৪৫ কোটির ভরসায়। ৪৫ কোটি শেষ হতে সময় লাগে নি। কিন্তু নবদিশা কাউকে দিশা দেখাতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি। ১৩টি অ্যাম্বুলেন্স কেনা হয়েছিল। সেই গাড়িগুলি নাকি ড্রাইভিং-এর ট্রেনিং দিয়ে আত্মসমর্পণকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৩টি অ্যাম্বুলেন্সের কী পরিণতি হয়েছে তা জানার চেষ্টা অবশ্য করি নি, তবে সুব্বাইয়া সাহেবের স্বাক্ষরিত 'ঋণ মঞ্জুরিপত্র নিয়ে' হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো কিছু যুবককে দেখেছি। সে কাগজ তাদের হাতের তালুর ঘামে ভিজে গেছে, কিন্তু ঋণের মুখ দেখাতে পারে নি। সমাজ বিজ্ঞানীরা কখনও অনুসন্ধান করে দেখবেন সার্বিকভাবে এই 'এমপিরিকাল স্টাডি'টা কতটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হোম স্টে আর ছোট চা-বাগান যদি বিকল্প অর্থনীতির পথ না দেখাত তাহলে ডুয়ার্স জুড়ে এই শতকের শুরুতে মাথা চাড়া দেওয়া অস্থির পরিস্থিতির এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটত না। দু'টি উদ্যোগের কোনওটাই নবদিশা প্রসূত নয়, বরং ছোট চা চাষিরা সকলে এখনও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমির 'বৈধতা পত্র' পায় নি বলেই খবর— প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা।

ডুয়ার্সের জনজাতিরা মাওবাদকে আশ্রয় দেয় নি আর পাহাড়ের আন্দোলনকেও প্রশ্রয় দেয় নি। তপশিলী সম্প্রদায়ের যুবকদের একাংশ সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূলস্রোতে ফিরে এসে আজ কেউ হোম স্টে আর কেউ চা চাষে মন দিয়েছে, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি। 'করোনা-উত্তর ডুয়ার্স' তাদের জন্য কে জানে, কোন ভবিষ্যৎ নিয়ে অপেক্ষা করছে!

*(ইবুক 'লকডাউনের দিনলিপি' থেকে নির্বাচিত পুনঃপ্রকাশ)*

# সেমিকোলন না অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স?

সঞ্জয় সাহা

করোনা। এক অতলান্ত সেমিকোলন। বিরাট হা—মুখ। ভেতরে ঢুকে পড়ছে বিরক্তিকর অবকাশ। ঢুকে পড়ছে রক্ত অশ্রু আর ঘামের বিরাট অনুপস্থিতি। এক দৃশ্যত ব্ল্যাক হোল। জীবন থেকে, এমনকি মৃত্যু থেকেও। সারা পৃথিবীর মৃত্যুর হার কমেছে। আশ্চর্য সত্য। মৃত্যুর ভয়ে মৃত্যু কমে যাওয়া! এ যেন মৃত্যুরই নতিস্বীকার। অন্য রোগ-ব্যাধি সহ যাবতীয় উপসর্গ যাতে আমরা 'না' হয়ে যাই তখন তখনই তারা সবাই ছুটি নিয়েছে। যা করে করোনাই করবে। আর করোনা, সে তো "একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদির গড়"।

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক/ এবারের যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্য--- ইত্যাদি। করোনা তো সেই অবকাশ দিয়েছে। ফিরে দেখবার। নিজের কাছে ফেরা, নিজের পরিবারটির কাছে ফেরা, বেয়ারা কিশোরীটির কাছে ফেরা, দুষ্টু শিশুটির কাছে ফেরা। সত্তরোর্ধ বাবা-মার কাছেও ফেরা। না হলে ঘুড়ির সুতো মত আমরা চলছিলাম এক দিকশূন্যপুরে, এক কৃত্রিম ঝলমলের দিকে। যেখানে অর্থ হয়ত আছে তবে অনর্থ কম নেই, গতি হয়ত আছে তবে স্থিতির সুখ নেই তাতে, বিস্তৃতির আয়োজন আছে ঠিকই সংকোচনের টান নেই তাতে।

সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন/ থাকে শুধু অন্ধকার... না শুধু যে অন্ধকার আছে তা তো নয়। আলোও এসেছে ঢের এবং 'এ আঁধার আলোর অধিক' কিছু ক্ষেত্রে। ফিরে এসেছে, হ্যাঁ ফিরে এসেছে উড়িষ্যার সৈকতে হরিণ, ইউরোপের রাস্তায় বন্য পশুর দল, আর আমার উঠোনে যে পাখিরা ভুলে গেছিল আমাকে কয়েক দশক। ছাদের কার্নিশে, পুরনো ঘরের জানালার আক্ষরিক অর্থেই শান্তির পায়রারা উড়ছে। কিচিরমিচির বিনিময় তাদের। হয়ত আমাদের সাথেও, আমরা বুঝি না। কবে বুঝব পাখিদের ভাষা! আমাদের ভাষাবিজ্ঞান কত ক্ষুদ্র! আক্ষরিক অর্থেই 'বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভীড় শুধু'। নাহলে পাঁচ হাজার বছর ধরে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করেও কি আমরা জানতে পারলাম ডলফিন-এর জ্ঞানার্জন রহস্য, ঘোড়ার উপযোজন ক্ষমতা, পতঙ্গদের সৌন্দর্যবোধ বা মাছেদের রাষ্ট্রচেতনা? তাই অন্য প্রাণীরা যে দক্ষতায় মানিয়ে নিতে পারে আমরা তা পারি না। আমাদের জ্ঞানগর্ব ধুলোয় মিশে যেতে থাকে।

রাজনীতি এসে যায় তবু রাজনীতি বলব না। বরং পড়শিকথা বলি, বলি সেই আজব ঘটমান আরশিনগর, জানালা দিয়ে কালভার্টের উপর লকডাউনকে উপেক্ষা করে বৈকালিক আড্ডার কথা। যে আড্ডায় কলেজ পড়ুয়া মৌসুমী টপ আর বারমুডা পরে ফোন করেই চলে অবিরাম। কখনও ওপক্ষের কথা থামিয়ে এদিকে একটি দুটি অসমাপ্ত বাক্য, আবার কখনওবা এদিকের কথা থামিয়ে ওদিকে ছুঁড়ে দেয় দু-চারটি অসমাপিকা ক্রিয়া বা অপরিবর্তনীয় অব্যয় পদগুলি। মৌসুমীর খোলা ফর্সা পা দেখার জন্য ইতিউতি ভিড় জমে না ছেলেছোকরাদের লকডাউন-এর আগের মত। আমি শুনি রিনা বৌদির আক্ষেপ বিরক্তি 'আগে তো অগো বাড়ির উপর দিয়া জল আনতে যাইতাম, করুনার ভয়ে ওরা ভেতরের গেটে তালা ঝুলাইছে। কও তো মাসি পাড়াপড়শির সাথে এই ব্যবহার কি ঠিক?' আসলে তালাটা তো আমি ঝুলিয়েছি, তাই না শোনার ভান করি। প্রদীপের তলার অন্ধকারের মত এদের শিক্ষা

স্কুল বই সচেতনতা এসব শব্দের সাথে সম্পর্ক নেই কয়েক পুরুষের, এখন বোঝাতে গেলে বিপদে পড়ব। উঠে আসবে আমার আজন্ম অসামাজিকতার অনেক উদাহরণ। সত্যি তো করোনা ছাড়াও অনেক উপলক্ষ এ জীবনে, এই সময়প্রবাহে যায় আসে, আমি থাকি আমার পাঠ ঘরের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'এ। হঠাৎ করেই তো আমার দিকে একটা প্রশ্ন চিহ্ন ছুটে এল। প্রশ্নকর্তা যতটা রিনা বৌদি ততটাই তো আমি নিজেও। অথচ আমি তো রাজস্থানের ভিখারিদের নিয়ে লিখেছি, ভুপালের ফকিরদের নিয়ে লিখেছি, আরও লিখেছি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথের সেই মসজিদটিতে কাজ করা এতিম কিশোরের কথা অথচ... 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া...'

করোনা না হলে কি জানতাম মানুষের আস্তিনে শুধু হিংসা নেই, আছে প্রেম। মানুষ আজও মানুষের জন্য জমিয়ে রেখেছে ভালবাসা, সহমর্মিতা। মানুষ আজও মানুষকেই ভালোবাসে। কে যেন বলছিল সেদিন দাতা দুই প্রকার - প্রকৃত দাতা আর বিজ্ঞাপন দাতা। বিজ্ঞাপনের বাইরেও প্রচুর মানুষ মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে, আশ্রয় হয়ে উঠেছে আশ্রয়প্রার্থীর। চাল ডাল আলু সোয়াবিন আর এক বোতল সরষের তেল যাচ্ছে নবদ্বীপের বিগ্রহ বাড়ি থেকে তেঘরী পাড়ার মসজিদে। মানুষ মানুষকেই জড়িয়ে ধরতে চায় বিপদে -আপদে আর রাষ্ট্রবিপ্লবে। রতন টাটাকে যখন 'ভারতরত্ন' সম্মান দেওয়ার কথা উঠেছিল প্রথমে, রে রে করে উঠেছিল কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দল। সেই রে রে করে ওঠা ব্যক্তিদের যুক্তিতে আমারও সমর্থন ছিল মাইক্রোলেভেলে। ভুল বুঝেছিলাম কিছু পরেই, এখন তো আরো স্পষ্ট হল টাটা সাহেব যে বড় শিল্পপতি তাই তো নয় শুধু তিনি আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশি ভারত দরদী, ভারতীয়। এরকম কত ভুল তো খুঁজে পাচ্ছি স্মৃতির জাবর কাটতে গিয়ে বা পূর্ণ অবকাশে নিজেকেই নিজে একবার পাঠ করতে গিয়ে! কত ভ্রান্তি নিয়েই যে আমাদের এই অবিরল বেঁচে থাকা!

না, ফিরে আসি সেই সেমিকোলনের কথায় যা ট্রাফিক সিগন্যালের মত থামিয়ে দিয়েছে আমাদের জীবন। তবু এটা কোনও 'ফুলস্টপ' নয়। কারণ আমরা জানি পেলিকান ক্রসিংয়ে আলোর রং আবার সবুজ হবে দ্রুত, জীবন চলবে জীবনের মত। মাঝের এই সময়টুকু শুধুই আত্মজিজ্ঞাসার, নিজেকে প্রশ্ন করার এবং নিজেকেই উত্তর দেবার। আর কিছুটা দেখার, দেখার ভুবন গ্রামের প্রধান ট্রাম্পের অক্ষম দাঁত ঘষ্টানি, কফিনে শুয়েও উলুখাগড়ার মত কিছু লোকের মমতা-মোদির দাবা খেলায় 'ফড়ে'র ভূমিকা নেওয়া, আমপুলিশের সাথে আমজনতার চু কিতকিত খেলা—এইসব। মাঝে মাঝে মনে হয় পাহাড় সাগর বশ মেনেছে সেই কবে, আর চন্দ্রযান টু হয়ে যাবার পরও করোনা ভাইরাসের মত এত ছোট কিছুর কাছে

**রতন টাটাকে যখন 'ভারতরত্ন' সম্মান দেওয়ার কথা উঠেছিল প্রথমে, রে রে করে উঠেছিল কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দল। সেই রে রে করে ওঠা ব্যক্তিদের যুক্তিতে আমারও সমর্থন ছিল মাইক্রোলেভেলে। ভুল বুঝেছিলাম কিছু পরেই, এখন তো আরো স্পষ্ট হল টাটা সাহেব যে বড় শিল্পপতি তাই তো নয় শুধু তিনি আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশি ভারত দরদী, ভারতীয়।**

মানুষের অসহায়তা! যেন এসব মোটেই সত্য নয়। আমরা যেন এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহে এক অ্যাবসার্ড নাটক দেখছি 'থানা থেকে আসছি'। যে সিনেমায় পরিবারের সবাই নিজের অপরাধ নিজেই খুঁজে পেয়েছিল এক ইন্সপেক্টরের ক্রমাগত প্রশ্নের উত্তরে অথচ যে নামে বাস্তবে কোনও ইন্সপেক্টর ছিল না কোনওদিন। হয়ত সে নামে কোনও থানাই নেই।

করোনা কল্পনা মাত্র।

প্লিজ, প্রিস্টলে সাহেব, আপনি আরেকটি চিত্রনাট্য লিখুন...

*(ইবুক 'লকডাউনের দিনলিপি' থেকে নির্বাচিত পুনঃপ্রকাশ)*

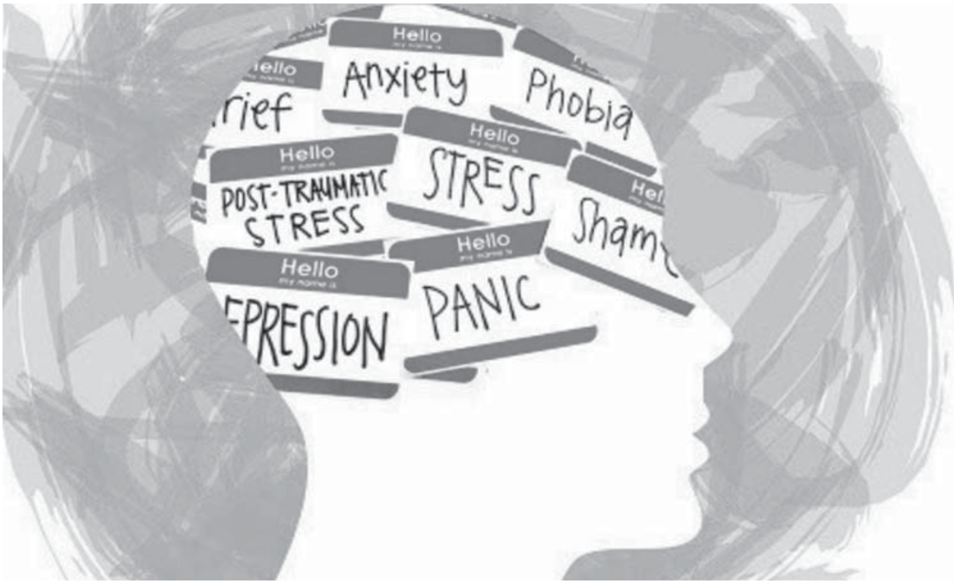


# চিন্তা করানোর কোনও পরিষেবা মিলবে কি?

## শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজ সম্পর্কে 'কায়মনোবাক্য' শব্দটার কথা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজ হয় শরীর, মন আর বাক্য দিয়ে। এর মধ্যে দুটো সগৌরবে চলছে। কিন্তু মন দিয়ে কাজ বা চিন্তা অনেকটাই দুয়োরানি। বসে বসে চিন্তা করাটাও যে কাজ, তা অনেকে বিশ্বাস করেন না। চিন্তা করার মত অবকাশ যাতে না জোটে তার জন্য সময় কিনে নেওয়ার সিস্টেম সর্বদা চালু। কিন্তু হঠাৎ এক তুচ্ছ ভাইরাসের দাপটে চিন্তা করার মত সময় পেয়েছি আমরা।

অবকাশ তো এল, চিন্তা কি আসছে? নাকি দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখে তার পক্ষে যুক্তি যোগাড় করছি? আমি কি বুঝতে পারছি যে আমার মনের কতটা আমার নিজের আর কতটুকু অন্যের তৈরি করে দেওয়া?

প্লেগ উপন্যাসের সেই চরিত্রটার নাম মনে নেই যে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে? তাঁর পুলিশের হাতে পড়ার কথা, কিন্তু প্লেগ এল। সে চিন্তা করতে শুরু করে এই ভেবে যে সংক্রমণ কখনই থামতে পারে না। আসলে তাঁর ছিল জেলে যাওয়ার ভয়। সে গল্পের শেষের দিকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, সেই ডাক্তারকে

বলছিল, একটা মানুষের দুটো বড় রোগ হতে পারে না। 'কখনও শুনেছেন যক্ষা রোগীর ক্যানসার হয়েছে? ক্যানসারের রোগী গাড়ি চাপা পড়েছে?', এই রকমটাই সে বলেছিল।

শত অবকাশেও সেই চরিত্রটি নিজের কারাগার থেকে বেরিয়ে 'চিন্তা' করতে পারত না। নিজেও বা কতটুকু পারছি?

লকডাউনে সুখে না থাকলেও অসুখি নই। তেমন কোনও সঙ্কট এখনও আসে নি। চারতলার খোলা জানালা দিয়ে প্রায়ই দেখছি কালবৈশাখীর হানা। পরিবেশ প্রায় মাসখানেক হল শুদ্ধ। হয়ত সেই কারণেই সে বার বার আসছে। আগে যেমন আসত। অলস দুপুরে স্কুলবেলার মত হিন্দি গান শুনছি, আমাদের কালের হিন্দি সিনেমার গান। সিনেমাগুলো মনে পড়ছে স্মৃতির শহর সমেত।

নায়ক নায়িকাদের খুব মতি থাকত ঠাকুর দেবতায়। তাঁরা পতিনিষ্ঠ হতেন। যারা সে সব সিনেমা বানাতেন তারা জানতেন তর্ক করা মেয়েদের সমাজ পছন্দ করে না। তবে সে মেয়েরা তখন সারেন্ডার করত আর এ কালের সিরিয়ালে তাঁরা জিতে গেলেও ঠাকুর দেবতায় আস্থা অটুট।

মেয়েরা ঠাকুরের ইচ্ছায় আপোষ করত, ঠাকুরের ইচ্ছেয় জিতছে।

ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু সাধারণ ভাবে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের 'শিক্ষিত' 'ভদ্রলোক'রা বিচিত্র কিছু পরস্পর বিরোধিতায় ভুগতেন। এঁরা জাতিভেদ, বর্ণভেদ বিশ্বাস করতেন। ব্যবসায়ীদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে অনীহা ছিল। ইংরেজি না জানাদের প্রতি তাচ্ছিল্য ছিল। ঘরের মেয়েরা হতেন অতি রক্ষণশীল আচার আচরণের মূর্ত উদাহরণ। আজকের জেনারেল কাস্ট বা বাঙালি বামুন কায়েত বৈদ্য সমাজে উক্ত বিরোধিতাগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায় নি।

চিন্তা করার ক্ষেত্রে এটা বাঙালি মধ্যবিত্তের এক সাধারণ অন্তরায়। বদ্ধমূল ধারণা মানুষকে আজীবন পরিচালনা করে। লক ডাউনের অবকাশে তাই হয় তো ভাবছি যে ধারনাকে তুষ্ট করার জন্য কী পারলাম কী পারলাম না। কিছুতেই আর ধারণাটাকে প্রশ্ন করতে পারছি না!

চুপচাপ দুশ্চিন্তা না করে চিন্তা করি এই অবকাশে। নিজের মস্তিস্কজাত চিন্তা।

শরাবী সিনেমার গান শুনছিলাম। "চুহা আগে বিল্লি পিছে—" অমিতাভ নিজেই গাইছিলেন। জিনাত আমান প্রায় খোলা বুকে থানায় ঢুকে পড়েছেন। অমিতাভ তাঁকে পবিত্র নারীর কর্তব্য বিষয়ক শ্লেষাত্মক 'ডায়লগ' দিলেন। জিনাতের মাথা হেঁট। পরে তিনি সতী নারী হয়ে নায়কের প্রেমে পড়বেন তা বলা বাহুল্য।

নায়কদের একটা বিধবা মা থাকত। পুত্রবধূর গুরু দায়িত্ব হল শ্বাশুড়ির সেবা করা। এটাও বদ্ধমূল ধারণা। সীতা শ্বাশুড়িকে ফেলে বরের সাথে বনে গিয়েছিলেন। দেওরের কাছে শ্বশুরের মারা যাওয়ার খবর পেয়েও শ্বাশুড়ির সেবা করতে ফেরেন নি অযোধ্যায়। বনে যাওয়া কম্পালসারি ছিল না তাঁর।

মধ্যবিত্ত এখনও মনে মনে অথরিটারিয়ান নীতিকে ভালবাসে। ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী। গুরু ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও এক নেতার আবির্ভাবে বিশ্বাস করে। কমুনিস্টরাও শেষাবধি জ্যোতি-বুদ্ধের মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পায় নি কি?

পাথরকুচি গাছের টকটকে লাল ফুলগুলো গুচ্ছ হয়ে ফুটেছে।

বিলেতের খবরের কাগজ পড়ছিলাম উপুড় হয়ে। মরে গেলে কফিনে ভরে কবর দেওয়ার জন্য যে কোম্পানিগুলো আছে, তারা চুটিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। মোটামুটি খরচ হাজার দেড়েক পাউন্ড। বাইশ তেইশ শো পাউন্ড দিলে আরও অনেক সুবিধের সঙ্গে বিনামূল্যে সান্ত্বনা আর উপদেশের লোক মিলবে। ইংল্যান্ড এর অর্থনীতির ভিত্তি হল পরিষেবা।

চিন্তা করানোর পরিষেবা হতে পারে কি?

*(ইবুক 'লকডাউনের দিনলিপি' থেকে নির্বাচিত পুনঃপ্রকাশ)*

রাজনগরের রাজনীতি। পর্ব ৮

# ক্ষমতাসীন সিপিএমের নরমেধ তাণ্ডবে কংগ্রেসী রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল আশির দশক

## অরবিন্দ ভট্টাচার্য

বাম আমলে সংগঠিত ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস বিরোধী দলগুলির সমর্থকদের ত্রস্ত করে তুলল। শুধু নিচু তলার সমর্থক নয়, সিপিআই(এম) ক্যাডার বাহিনীর হামলার হাত থেকে কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের নেতারাও নিষ্কৃতি পেলেন না। দিনটা ছিল ১৯৮৩ সালের ১৭ আগস্ট। তুফানগঞ্জের কাশিরডাঙ্গায় আক্রান্ত হলেন রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক সন্তোষ রায় ও তাঁর সঙ্গী জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি মিহির গোস্বামী, দুলাল দে এবং কার্তিক প্রামাণিক। ঠিক কী ঘটেছিল সে দিন? সে দিন দুপুরে কোচবিহার শহর থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে ধলপল গিয়েছিলেন সন্তোষবাবু। ক'দিন আগেই ধলপলে খুন হয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় সিপিএম নেতা গৌতম দে। পরদিন সেই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএম সমর্থকরা ধলপল হাটের পাশে কংগ্রেস সমর্থকদের পাঁচটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়িগুলো। যাদের বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল সন্তোষবাবু তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করতে ১৭ আগস্ট দুপুরের দিকে কোচবিহার শহর থেকে জিপে চড়ে ধলপলে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থানীয় এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে আলোচনা সেরে সন্তোষবাবুরা যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন কাশিরডাঙ্গায় একদল সশস্ত্র সিপিএম সমর্থক লাঠি সোটা তীর ধনুক বল্লম নিয়ে তাঁদের পথ রোধ করে। গাড়ি থেকে নামিয়ে শুরু হয় তাঁদের উপর নৃশংস হামলা। সন্তোষবাবু ও তাঁর সঙ্গী মিহির গোস্বামী, দুলাল দে ও কার্তিক প্রামাণিককে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধোর শুরু হয়। মারতে মারতে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায় দুষ্কৃতকারীরা। এ খবর দ্রুত পৌঁছে যায় তুফানগঞ্জে। তেল নেই বলে সরকারি অ্যামবুলেন্স আসতে অস্বীকার করে। দীর্ঘ সময় ধরে তারা রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠের মধ্যেই পড়ে থাকেন। এরপর তুফানগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় পাঁচজনকে উদ্ধার করে কোচবিহার সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। এই বেনজির নৃশংস ঘটনায় রাজ্যে জুড়ে হৈচৈ পড়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ আগস্ট গোটা কোচবিহার জেলা জুড়ে সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়। কলকাতা থেকে রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোপালদাস নাগ সহ একদল কংগ্রেস নেতা কোচবিহারে ছুটে আসেন। পুলিশ এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক বীরেন দে সরকার অবশ্য বলেন, এ ঘটনায় তাদের দলের কেউ জড়িত নয়, এটি কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি।

সন্তোষবাবুর উপর হামলার ঘটনার পরও কিন্তু হিংসা থেমে থাকে নি। ৩০ নভেম্বর ১৯৮৪। মাথাভাঙার শিবপুর গ্রামে ঘটে গেল এক নৃশংস

গণহত্যার ঘটনা। একদল উন্মত্ত সিপিএম সমর্থকের পৈশাচিক হামলায় প্রকাশ্য দিবালোকে ওই গ্রামে ওই দিন খুন হয়ে গেলেন পাঁচজন সংখ্যালঘু মানুষ। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হল আরও এক জনের। মৃতদের নাম সিরাজ মিয়া, সমাজ মিয়া, টারু মিয়া, নাসিরুদ্দিন মিয়া, জহির মিয়া, ইসলাম মিয়া। আহত হলেন অসংখ্য মানুষ। এরা সবাই ছিলেন কৃষিজীবি পরিবারের মানুষ। সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সশস্ত্র সিপিএম সমর্থকের তাণ্ডবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১৮৬ টি বাড়ি। গৃহহীন হলেন একটি গোটা গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র সংখ্যালঘু মানুষ। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ২৯ নভেম্বর শিবপুর গ্রামে ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে জমির মালিক সিরাজ মিয়াদের সাথে তার বর্গাদারের বিরোধ বাধে। স্থানীয় সিপিএম সমর্থকরা বর্গাদারের পক্ষ নেয়। ক্রমে সেই বিরোধ সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। সিরাজের লোকজনের হামলায় প্রাণ হারান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধান নগেন বিশ্বাস। এই ঘটনায় আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। এই ঘটনার বদলা নিতে পরদিন সকালে শিবপুর এবং আশপাশের এলাকা থেকে কয়েকশ সশস্ত্র সিপিএম সমর্থক সংঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণ চালায় সিরাজ মিয়াদের গ্রামে। সাত সকালে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না গ্রামের মানুষ। টাঙ্গি বল্লম রামদা তীর ধনুক বোমা নিয়ে চলে যথেচ্ছ হামলা। গ্রাম জুড়ে শুরু হয়ে যায় বহ্নুৎসব। টাঙ্গি বল্লম তীরের ফলায় বিদ্ধ হয়ে আর জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যান পাঁচজন মানুষ। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও এক জনের। সংখ্যালঘু গণহত্যার এই বিরল এই ঘটনায় আলোড়িত হয় গোটা দেশের রাজনীতি। দিল্লি থেকে ছুটে আসেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। ভস্মীভূত শিবপুর গ্রাম পরিদর্শন করে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে এই ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শিবপুর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। পুলিশ এই গণহত্যার ঘটনায় সিপিএম নেতা সুধীর প্রামাণিক সহ ৯৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। ঘটনার পর দীর্ঘ ৩৬ বছর কেটে গেছে। মানসাই ধরলা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া আজও শেষ হয় নি। ইতিমধ্যে আসামিদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন।

১৯৮৫ সালের ৭ আগষ্ট। মাথাভাঙার কংগ্রেস নেতা মহেশ বাসুনিয়া কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে মিনিবাসে চেপে একটি শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে গোপালগঞ্জে যাচ্ছিলেন। পথে নয়ারহাটের কাছে শান্তবাবুর মোড়ে একদল সশস্ত্র সিপিএম সমর্থক বাসটিকে দাঁড় করায়। ওদের কাছে খবর ছিল মহেশ বাসুনিয়া এই বাসেই আছেন। দলের ওপরতলার নির্দেশ ছিল তাকে নিকেশ করে দিতে হবে। তাই কাল বিলম্ব না করে অপারেশন শুরু হয়ে যায়। বাস থেকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামিয়ে প্রচণ্ড প্রহারের পর মাছ ধরার কোঁচা আর বল্লম দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় মহেশবাবু ও তার সঙ্গী গোরাচাঁদ রায়কে। দুষ্কৃতকারিদের হামলায় গুরুতর আহত হন মহেশবাবুর সঙ্গী আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী। এই ঘটনায় আহত জনৈক তুষার কান্তি রায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ২৩ জন সিপিএম সমর্থকের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। দীর্ঘ ২৫ বছর পর ২০১০ সালের ৩০ জুলাই কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক এই মামলায় বারো

**৩০ নভেম্বর ১৯৮৪। মাথাভাঙার শিবপুর গ্রামে ঘটে গেল এক নৃশংস গণহত্যার ঘটনা। একদল উন্মত্ত সিপিএম সমর্থকের পৈশাচিক হামলায় প্রকাশ্য দিবালোকে ওই গ্রামে ওই দিন খুন হয়ে গেলেন পাঁচজন সংখ্যালঘু মানুষ। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হল আরও এক জনের। মৃতদের নাম সিরাজ মিয়া, সমাজ মিয়া, টারু মিয়া, নাসিরুদ্দিন মিয়া, জহির মিয়া, ইসলাম মিয়া। আহত হলেন অসংখ্য মানুষ। এরা সবাই ছিলেন কৃষিজীবি পরিবারের মানুষ।**

জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মামলা চলাকালীন আট জনের মৃত্যু হয়। বাকি তিন জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

মহেশ বাসুনিয়া ছিলেন রাজবংশী সমাজের একজন কৃতী সন্তান। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতক মহেশবাবু কর্মজীবনের শুরুতে একজন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭০ সালে শিক্ষতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পূর্ণ সময়ের জন্য কংগ্রেস দলের সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। মহেশবাবুর স্ত্রীর অভিযোগ, তার স্বামীর জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত হয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সহজ পথ বেছে নেয় সিপিএমের একদল নেতা। বলাবাহুল্য তারা কিন্তু অধরাই থেকে গেছে।

**সাম্য স্থাপনের নামে বামপন্থীদলগুলির আগ্রাসী মনোভাবের মোকাবিলায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়াতে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র বাম বিরোধী ছাত্র-যুবরা অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ধাঁচে ১৯৯৪ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অল কামতাপুরি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আকসু) নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুললেন।**

এবার আসি বাম আমলে শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলন দমনে পুলিশ নির্ভরতা প্রসঙ্গে। ছয়ের দশকের শেষ দিক থেকে হুসলুডাঙার একদা জোতদার পঞ্চানন মল্লিক ও সম্পদ রায়ের নেতৃত্বে যে উত্তরখন্ড আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৭৭এ রাজ্যে বাম সরকার গঠিত হবার পর থেকে তা একটু একটু করে আবার দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৮০ সালে উত্তরখন্ড আন্দোলনের নেতারা পৃথক কামতাপুর রাজ্যের ডাক দেন। কোচবিহার জেলাতে অবশ্য পঞ্চাননবাবুদের সেই আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারে নি। তবে কংগ্রেসের পতনের পর এ জেলায় যুক্তফ্রন্ট ও বাম আমলে জোরজুলুমে জমি হারানো গ্রামীণ অসন্তুষ্ট বঞ্চিত মানুষজনের (বামেদের ভাষায় জোতদার) একটা বড় অংশ এ জেলায় নতুন করে সংগঠন গড়লেন উত্তরবঙ্গ তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সংগঠন (উতজাস)। মূলত উত্তরবঙ্গের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু করল এই সংগঠন। তাদের এজেন্ডায় কোথাও পৃথক রাজ্যের দাবি ছিল না। একটি জনজাতিকে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলন ক্রমেই গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গ্রামগঞ্জের অনেক শিক্ষিত রাজবংশী যুবক এই আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়লেন। আন্দোলনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে, রাজ্যের বাম সরকার এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করার পরিবর্তে আন্দোলনের গায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা এঁটে দেয় এবং আন্দোলন দমনে পুলিশকে লেলিয়ে দেয়। শুরু হল ব্যাপক ধরপাকড়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৮০ সালের ১১ এপ্রিল তুফানগঞ্জ শহরে এক বিশাল মিছিল বের করে উতজাস। থানার সামনে সেই মিছিল এলে উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালিয়ে দেয়। গুলিতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারি গুরুতর আহত হন। গোটা শহরে ১৪৪ ধরা জারি করা হয়। ২২ এপ্রিল ১৯৮০ নরেন বর্মন নামে গুলিতে আহত এক উতজাস কর্মীর মৃত্যু হয়। নরেন বর্মনের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা তুফানগঞ্জ জুড়ে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত কড়া পুলিশ পাহারায় মৃতদেহটি বজরাপুড়ে তার গ্রামে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়।

উতজাস আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাম সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে বামদলগুলো রাজনৈতিক কর্মসুচি হাতে নেয়। ১৯৮০ সালের ৬ জুলাই কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী এক সমাবেশের ডাক দেয় বামপন্থীদলগুলো গোটা জেলা থেকে হাজার হাজার বাম সমর্থক মিছিল করে সমাবেশস্থলে আসেন। রাজ্যের এক ডজন নেতা মন্ত্রী ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। জেলার গ্রামেগঞ্জে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সভাসমিতির কর্মসূচী গৃহীত হয়। তিন চার বছর চলার পর ধীরে ধীরে উতজাস আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

১৯৮৪ সালে কোচবিহারের পার্শ্ববর্তী জেলা অসমের ধুবরিতে ভারতীয় কোচ-রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা নামে একটি নতুন সংগঠনের জন্ম হয়। তেজপুরের প্রাক্তন সাংসদ ড. পূর্ণনারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠনের প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরখন্ড দলের সভাপতি পঞ্চানন মল্লিক। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় যে চার দফা দাবি সনদ গৃহীত হয় সেগুলো হচ্ছে;

১) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান;
২) অনুপ্রবেশকারিদের বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো;
৩) কোচবিহার সহ উত্তরখন্ড দলের গৃহীত এলাকাগুলোকে কেন্দ্রশাসিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা;
৪) কামরূপী-কামতাপুরী ভাষা সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৯৮৬ সালের ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার জেলার বুড়িরহাটে ভারতীয় কোচ-রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের রাজকন্যা তথা জয়পুরের মহারানী শ্রীমতি গায়ত্রী দেবী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল রাখা হয়। এই সম্মেলনে; (ক) উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে পৃথক রাজ্য স্থাপন, (খ) বীর চিলা রায়ের নামে সামরিক বিভাগ চালু করা, (গ) কোচ-রাজবংশীদের জন্যে সরকারি চাকুরিতে শতকরা আশি শতাংশ সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়।

সাম্য স্থাপনের নামে বামপন্থীদলগুলির আগ্রাসী মনোভাবের মোকাবিলায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়াতে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র বাম বিরোধী ছাত্র-যুবরা অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ধাঁচে ১৯৯৪ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অল কামতাপুরি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আকসু) নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুললেন। রাজনীতির বাইরে মূলত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারক বলে এই সংগঠনের নেতারা দাবি করলেন। অল কামতাপুরি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন গোটা উত্তরবঙ্গে ছাত্র সমাজের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আকসুর জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে যায়। এগিয়ে আসেন অতুল রায় ও নিখিল রায়। এই দুই নেতাই এক সময় কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার ডাউকিমারিতে নিখিল রায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে গঠিত হল কামতাপুর পিপলস পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল। নতুন দলের সভাপতি নির্বাচিত হন শিলিগুড়ির অতুল রায়। সহসভাপতি হন কোচবিহারের ভৈরব ঈশোর। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ডাউকিমারির নিখিল রায়।

নবগঠিত কেপিপি দলের আত্মপ্রকাশ গোটা উত্তরবঙ্গের জনমানসে ব্যাপক আলোড়ন ফেলে দেয়। পৃথক রাজ্যের দাবি ছাড়াও, কামতাপুরি ভাষার সংবিধানিক স্বীকৃতি, এই এলাকার সমস্ত জাতি ও আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান ও অনুপ্রবেশ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয় কেপিপির পক্ষ থেকে।

কোচবিহার জেলা জুড়ে অসংখ্য সভা সংগঠিত করা হতে থাকে নবগঠিত এই রাজনৈতিক দলটির পক্ষ থেকে। কিন্তু কেপিপির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করতে রাজনৈতিক মোকাবিলার পরিবর্তে আবার পুলিশের হাতে দায় চাপিয়ে দিল রাজ্যের বাম সরকার। ২৭ নভেম্বর প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল 'অপারেশন কামতাপুর' অভিযান। শুরু হল এই আন্দোলনের সাথে জড়িতদের সন্দেহে ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠনের দাবিতে ২০০০ সালের ৬ ডিসেম্বর কোচবিহার বিমানঘাঁটি সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হল কামতাপুর পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় সমাবেশ। এই সভায় ব্যাপক জন সমাবেশে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ক্ষমতাসীন সরকার। তাই পুলিশি দমন পীড়ন বেড়েই চলল।

*(এরপর আগামী সংখ্যায়)*

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। তৃতীয় পর্ব

# গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি

**প্রশান্ত নাথ চৌধুরী**

**গত চার দশকে ধরে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কতটা বদল এনেছে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক? কতটা এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে? প্রত্যন্ত উত্তরবাংলার দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা জাগানো ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে যেটুকু বদল ঘটেছে তা একদিনে হয় নি, ব্যাংক কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় তা তিলে তিলে হয়েছে। পিছিয়ে পড়া উত্তরের বিবর্তনের পথে সেসব কথাগুলি কি কোথাও লেখা রইবে না? অবসরপ্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংক কর্মী ও এই ব্যাংকের প্রথম নিজস্ব ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রশান্ত নাথ চৌধুরী এবার থেকে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করলেন তাঁদের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের গোড়া থেকে গড়ে ওঠার গল্প। স্মৃতি হাতড়ে বের করে আনছেন নানান টুকরো টুকরো কথা ও কাহিনি।**

তিন

এর মধ্যে একদিন ম্যানেজারদের মিটিং ডাকা হয়েছিল হেড অফিসে। প্রথম মিটিং। নীচের তলায় একটা আধো অন্ধকার ঘরে মিটিং বসেছিল। ঘরটি ছিল বেজায় গরম। শ্রী প্রদীপ দাস সাহেব মিটিং-এ যাদের গ্রোথ খারাপ তাদের কিছুটা রগড়ে দিলেন। উনি একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন ‘ঋণ দিয়ে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করুন দেখবেন তার ফলে সঞ্চয় ও ঋণ দুটো দিকের উন্নতি হবে।’ উনি সেদিন আর একটা দামি কথা বলেছিলেন ‘এক পয়সা খরচ কম করলে এক পয়সা লাভ বাড়বে। খরচে প্রথম থেকেই লাগাম টানতে হবে’। উনি প্রচারের জন্য পয়সা খরচ করতে রাজি ছিলেন না, বললেন, ‘আমাদের এতগুলো কর্মী আর সাইন বোর্ড আমাদের প্রচারের হাতিয়ার’।

মিটিং শেষ হতে দেরি হয়েছিল। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির ছেলেরা সে রাত কোচবিহারে থেকে গেল। আমরা যারা কোচবিহারে থাকতাম তাদের বাড়িতে অনেকেই রাত্রিবাস করেছিল। এমন রাত কাটান ছিল সে সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক সেদিন মিটিং-এর শেষে ঠিক হয়েছিল আমরা ডি.আর.আই. (ডিফারেনসিয়াল রেট ওফ ইনটারেস্ট) প্রকল্পে রিক্সার জন্য ঋণ দেব। তাতে গরীব মানুষ ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাবে। রিক্সার পিছনে বড় করে লেখা থাকবে “উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (একটি সরকারি সংস্থা) অমুক শাখার নিকট দায়বদ্ধ”।

উত্তরবঙ্গের পথে প্রান্তরে এমন প্রায় দু-হাজার রিক্সা ঘুরে বেড়াত। পথে যেতে যেতে সেই সব রিক্সা দেখলে আনন্দে বুক ভরে উঠত। পরবর্তীকালে আমাদের এই ব্যাঙ্ক ময়নাগুড়িতে হিমঘর নির্মাণের

জন্যও ঋণ দিয়েছিল। সেই সময় ময়নাগুড়ির ম্যানেজার শ্রী বানেশ্বর মন্ডল ও অফিসার শ্রী প্রশান্ত কুমার চৌধুরী (শান্তি) মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্যই ওঁরা আমার উপর পূর্ণ ভরসা রেখেছিলেন। আর এক বন্ধুর কথা বলব যার সাপোর্ট অস্বীকার করা যাবে না, তিনি তৎকালীন নাবার্ডের ডিডিএম শ্রী মিথিলেশ্বর ঝাঁ। ওর সঙ্গে দশ বছর দেখা হয় নি, তবুও ভালবাসার বন্ধন অটুট আছে।

গত পর্বে বলেছিলাম বহরমপুরে শ্রীহরি, বঙ্কি ও আমি কনফারেন্সে গিয়ে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একটা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম। রাস্তার কলেই স্নান সেরেছিলাম। দুপুরে গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত মিটিং চলেছিল। মিটিং শেষে খিচুড়ি ও ডিমের ঝোল খেয়ে আমরা খাগড়াঘাট রোড স্টেশনে চলে এলাম। আনরিজার্ভড কামরায় চেপে রাত জেগে অক্লেশে চলে এসেছিলাম কোচবিহার। দেখেছিলাম শ্রীহরিকে কোনও অসুবিধেই কাবু করতে পারত না। সাহেবের হাটে ওদের গ্রামের বাড়িতে বহুবার গেছি। ওদের বাড়িতে গেলেই প্রচুর পরিমাণে মুড়ি খেতে দিতেন মাসিমা। ফেরার সময় বাড়ির লাউ, বেগুন, শাক প্রচুর সঙ্গে দিতেন। শ্রীহরির নিঃশব্দে চলে যাওয়া আমরা অনেকেই মেনে নিতে পারি নি।

অনেক দিন আগে (তারিখটা মনে আছে ২৭.০৬.১৯৮০) একঘণ্টার 'পেন ডাউন স্ট্রাইক' আহ্বান করেছিল সর্বভারতীয় সংগঠন। আমরা সেই আহ্বান সার্থক রূপায়ন করেছিলাম। মনে আছে ওই এক ঘণ্টা পেন বন্ধ রাখার জন্য পুরো একদিনের বেতন কাটা হয়েছিল। তারপর যতবার দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল তাতে একটা দাবি ইউনিক ছিল। 'এক ঘণ্টার কাজ বন্ধের জন্য এক ঘণ্টার বেতন কাটা যাবে মানা যায়, কিন্তু পুরো একদিনের বেতন কাটা চলবে না'— এমনটাই ছিল আমাদের যুক্তি।

নিগমনগর শাখায় বদলির পর দিনহাটাতে মদনমোহন পাড়ায় কৃষি দপ্তরে কর্মরত এক ভদ্রলোকের (নরেন সরকার) বাড়িতে কিছুদিন ভাড়া ছিলাম। তাপস দেব আমার দিনহাটার অভিভাবক। তাপসের মামা ও দিদা তখন দিনহাটায় থাকতেন। আমি তাপসের বাড়ি খুব যেতাম। তখন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শঙ্করদা ও দুলাল, দুই এ.ডি.ও. মানিক ও নব এবং দীপক গোধুলী বাজারের মেসে থাকত। পরে গোধুলী বাজারে মেসের পাশে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। খুব ভাল সেই আস্তানা। সামনে বেশ বড় একটা মাঠ, গাছ গাছালি আর প্রচুর পাখির কলকাকলি। নব ও মানিকের সঙ্গে দীর্ঘ ৩৮ বছর পর এই সেদিন ফোনে কথা হয়েছে, যোগাযোগের মূল কান্ডারি দীপক এখন কোচবিহারে পাকাপাকি বাস করছে। দিনহাটার মত এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ শহর উত্তরে নেই বললেই চলে। দিনহাটাকে মনের কোণে আগলে রেখেছি।

১৯৮০-র এপ্রিল থেকে জুন মাসে বেশ কিছু নতুন ছেলে মেয়ে চাকরি পেল। অনন্য, কান্তি, টুলু, রতন, দেবব্রত প্রথম থেকেই ইউনিয়ন মাইন্ডেড ছিল, তারপর অসীম দাস, অশোক চৌধুরী, স্বপন ভট্টাচার্য, গোপী (টাইগার), স্বপন চৌধুরী ওরা চলে এল। ওদের দু-একজন মাঝে মাঝেই দিনহাটায় চলে আসত। নানা আলোচনা আড্ডায় ভালই কাটত। আমি এখনও অনেককে বলি আমাকে ব্যাঙ্কের অনেক কাজ শিখিয়েছে দিনহাটার দুলাল বাগচী। দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পরেও সেই সম্পর্ক অমলিন। দিনহাটায় একদিন তাপস দেব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তাপস গুহ রায়ের সঙ্গে। দুই তাপস আমার অনুজসম এবং আমার পরিবারের অত্যন্ত কাছের মানুষ। ওদের কর্তব্য নিষ্ঠা আর দক্ষতার আমি এখনও গুণগ্রাহী। দিনহাটার বিকাশ ফৌজদার, কনক, নীলেশ, রবীন, শম্পা, পরিমল, প্রশান্ত সবার সঙ্গেই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

নিগমনগরে আমার বদলি হয়েছিল শাস্তিমূলক— অনেকে বলত। কিন্তু ব্যাঙ্কার্স ক্লাব, আড্ডা, পিকনিকে আমরা নানা মজা করেছি। বেশ জমিয়ে আছি এটা অনেকেই জানত। দাপুটে কমল গুহ দিনহাটার বিধায়ক ও রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী ছিলেন। ডিসেম্বরের শেষে কনকনে ঠান্ডায় একদিন তাপস আর আমি রাত প্রায় ন'টায় নিগমনগর ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়ে রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছি। একটা জিপ গাড়ি সামনে এসে থেমে গেল। একজন বললেন 'দিনহাটায় যাবেন তো? উঠে আসুন'। উঠে দেখি কমলবাবু জিপ চালাচ্ছেন আর পাশে বসে সিতাই-এর এমএলএ দীপক সেনগুপ্ত। চওড়াহাটের মোড়ে এসে বলেছিলেন 'কোথায়

যাবেন'। আমরা ওখানে নেমে একটু হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম। কমলবাবুকে ছৌ নাচের টিকিট বিক্রি করতেও দেখেছি। ওঁরা মানুষের কাছাকাছি থাকতে চাইতেন। আর ডেভেলপমেন্টের মিটিংয়ে বকাবকির চূড়ান্ত করতেন।

পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থেকে একবার কমলবাবু পদত্যাগ করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মনে আছে একবার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অমল ব্যানার্জী সাহেবের সঙ্গে পাহাড়ের কয়েকটা শাখা ভিজিট করে রাতে ওনাকে পৌঁছে দিতে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে ফিরেছিলাম, দেখলাম অন্য একটি ঘরে খাটের ওপর লুঙ্গি পরে কমল গুহ বসে আছেন। নমস্কার করতেই ডেকে নিয়ে আড্ডায় বসালেন। তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

আমার নিগমনগরে থাকাকালীন দিনহাটাতে এক বিপুল কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লীড ব্যাঙ্কের স্টল ছিল, পাশে আমাদের ব্যাঙ্কের ব্যানার। সেবার প্রদীপ দাস সাহেব একদিন নিগমনগরে এলেন, যথেষ্ট গম্ভীর। খাতাপত্র দেখে বললেন, 'আমরা এখানে ৫০০ জন বর্গাদার ও পাট্টা হোল্ডার চাষীদের সরকারের এক পাইলট প্রকল্পে শস্য ঋণ দিতে চাই। তিনদিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। পারবেন তো'? সম্মতি জানিয়ে একজন অতিরিক্ত কর্মী চাইলাম। সাহায্যে প্রভাস দাস এসেছিল কোচবিহার থেকে আর বিকেলে ক্যাশ বন্ধ করে তাপস দেব চলে আসত ঋণ বিতরণ কেন্দ্রে অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। আমরা দু-দিনেই প্রায় ৪৩০ জনকে ঋণ দিয়েছিলাম। তৃতীয় দিনে সামান্য কয়েকজন ঋণ নিতে এসেছিলেন।

কৃষি মেলায় একদিন দেবব্রত ঘোষ এলেন, তিনি ছিলেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কোচবিহারের রুরাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার (স্কেল টু)। নানা কথার পর বললেন 'আপনার আর প্রদীপদার যে কী বিষয়ে মনান্তর বুঝি না। ভদ্রলোক খুব চাপে আছেন হেড অফিসে ক্রেডিট আর ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের হাল ধরার লোক নেই। আপনি চলে আসুন।' ওনাকে বলেছিলাম 'আরও কিছুদিন পরে'। প্রাক্তন ফৌজী বাদল সাহা আমাদের জিপ গাড়িটা চালাতেন। উনি ওপরতলার নানারকম খোঁজখবর রাখতেন। অফিসের কাজে কোচবিহার গিয়েছিলাম, বাদলবাবু বললেন 'চেয়ারম্যান সাহেব আপনাকে এখানে আনতে চায়। আপনি এবার না বলবেন না'। কর্মীদের বদলিজনিত উপকার করতে বাদলবাবু সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। পরবর্তীতে দেখেছি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের শাসনে রাখতে ম্যানেজমেন্টের অন্যতম অস্ত্র হয়েছিল 'বদলি'। সেই চক্কর এখনও কি রয়ে গিয়েছে?

এর মধ্যে আমাদের নিগমনগর শাখা থেকে গাভী প্রকল্পে বেশ কিছু ঋণ দেয়া হয়েছিল। আমি আর তাপস সাইকেলে চেপে ঋণ গ্রহীতাদের বাড়িতে যেতাম গাভী পরিদর্শনে। একবার এক গ্রামে রাতের বেলা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো সাইকেল সমেত কী ভাবে যে পার হয়েছিলাম তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। এক ইফতার পার্টিতে প্রধানের বাড়িতে খাটের উপর বসে পোলাও ও খাসির মাংস খাওয়ার কথাও ভোলা যাবে না। ইতিমধ্যে অজিত দাম নিগমনগরে ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার পদে যোগদান করে। অজিত খুব তাড়াতাড়ি কাজ শিখেছিল।

আমরা অফিসে সময়েই আসতাম। তখন ম্যানুয়ালের জমানা, সব কাজ কিন্তু আপ-টু-ডেট রাখতাম। জামালদায় থাকাকালীন একটা ঘটনা মনে পড়ে। শনিবার আমরা যে যার বাড়ি চলে যেতাম আবার সোমবার আমরা অফিসে ফিরতাম। আর প্রদীপ দাস সাহেব অধিকাংশ সোমবার জামালদা হয়ে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি যেতেন। কারণ তখন কোচবিহার থেকে মাথাভাঙ্গা-চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি যাওয়ার রাস্তা ছিল কিছুটা ভাল। এক সোমবার আমি ও পিনু ঠিক সময়ে জলপাইগুড়ি থেকে চলে এসেছি, প্রদীপ (সাহা)ও হাজির কিন্তু তপনের দেখা নেই। বাস মিস করে, সময়ে হাজির হওয়ার তাড়নায় গাড়ি ভাড়া করে তপন সেদিন শিলিগুড়ি থেকে জামালদা দশটার মধ্যেই এল। তাছাড়া ওর কাছে এক সেট চাবিও ছিল। তপন পৌঁছবার মিনিট কয়েকের মধ্যে চেয়ারম্যানের 'হাল্লা গাড়ি' এসে উপস্থিত। ততক্ষণে আমরা অবশ্য টেনশন মুক্ত।

আমি আগের পর্বে আলিপুরদুয়ার শাখার জয়ন্তর কথা বলেছি। সেই জয়ন্ত একসময় ঘুঘুডাঙ্গা শাখায়

কাজ করত। একদিন কোচবিহারে খবর এল ঘুঘুডাঙ্গা শাখার জয়ন্ত রায় খুব অসুস্থ। প্রদীপ দাস সাহেব ও আমি জলপাইগুড়িতে এলাম। যতদূর মনে আছে ওরা পান্ডাপাড়ায় একটা মেস বানিয়ে থাকত। ওরা মানে নিতাই গাঙ্গুলি, মোহন রায়, জয়ন্ত। শুভ, অসীম দেবনাথ, বিষ্ণুপদ রক্ষিত-রা হলদিবাড়িতে থাকত। জয়ন্ত যথেষ্ট অসুস্থ ছিল, চিকিৎসা চলছিল কিন্তু অফিসের সময়টাতে কে দেখবে? জয়ন্তর মা কলকাতায় ছিলেন। তাই ওকে কলকাতায় পাঠানো সাব্যস্ত হল। জয়ন্ত বলল 'যদি শুভ আমার সঙ্গে কলকাতা যায় তবেই আমি যাব'। শুভ তো কলকাতা যেতে সদাই প্রস্তুত। যদিও সেদিন বলল 'এখন আমার কলকাতা যাবার দরকার নেই'। ও চিরকাল সহজ মনের মানুষ। একটু জোর করতেই রাজি। পনের মিনিটের মধ্যে যে কলকাতা যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়া যায় তা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। ওদের কলকাতাগামী ট্রেনে তুলে দিয়ে আমরা রাতেই কোচবিহারে ফিরে এসেছিলাম। সে সময় ছোট বড় সব জায়গায় আমাদের মেস ছিল।

ফিরে আসি আগের বৃত্তান্তে। একদিন নিগমনগর ব্রাঞ্চে এসে বদলির অর্ডার পেলাম, হেড অফিসে পোস্টিং। আমার সতীর্থদের মন খারাপ। অজিত জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে আমাদের কোচবিহারে পৌঁছে দিয়েছিল। নিউ কদমতলায় শ্রীহরির বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। আমি এসেই চাপে পড়ে গেলাম। ডেভেলপমেন্ট ও ক্রেডিট দুটো দপ্তর, সঙ্গে দোসর রিফাইনান্স ও স্টেটমেন্ট। মনে আছে সে সময় শঙ্কর দত্ত ও প্রতিমা দত্ত স্টেটমেন্টের ব্যাপারটা সামলে নিয়েছিল। তবে ওরা কয়েকজন তুমুল গল্পগুজবও করত।

আমাদের অফিসে বেশ বড় করে সরস্বতী পুজো শুরু হল। তখন ব্যাঙ্কগুলোতে সরস্বতী পুজো চালু ছিল, পরে বন্ধ হয়ে যায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। একবার গোমটু ভুটানের কাছে পিকনিকে গিয়েছিলাম। পাহাড়ি নদীর কোল ঘেঁষে আসর বসেছিল। হাওয়ার দাপট সামলে কাঠের উনুনে প্রায় চল্লিশ জনের রান্নার আয়োজন। সে এক সংগ্রাম বটে। ভুটান ও ভারতকে জুড়ে নদীর ওপর কাঠের এক ঝুলন্ত সেতু ছিল, অপূর্ব তার গঠনশৈলী। পাথর আর ঝোপঝাড় ঠেলে ওই ব্রিজে ওঠা কম রোমাঞ্চকর ছিল না। কিছুদিন পরে হেড অফিসের কর্মীরা দেওয়াল পত্রিকাও বের করেছিল। পরস্পরের প্রতি আস্থা ভালবাসা না থাকলে এসব সম্ভব ছিল না, আজ তা বলাই বাহুল্য।

এখন ভাবতেও অবাক লাগে, শুরুতে একটা পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক চলছিল নির্দিষ্ট ম্যানুয়াল ছাড়াই। ভারত সরকারের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে কিছু সার্কুলার চালু ছিল। কর্মচারীদের সার্ভিস রেগুলেশন ছিল সামান্য কয়েক পাতার। ব্যাঙ্কিং ল অ্যান্ড প্র্যাকটিশের বই, অন্য ব্যাঙ্কের সার্কুলারের উপর ভিত্তি করে অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছিল। সদ্য স্কেল টু-তে প্রমোশন পাওয়া একজন তরুণ তাঁর অসীম আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পদ সামলেছিলেন, তাঁর সঙ্গীরাও ছিল তরুণ, তাদেরও মনোবল তুঙ্গে। তাই নানা বিরোধিতা বা সংঘর্ষ ভুলে গিয়ে আজও তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

আমরা সে সময় বিভিন্ন সার্কুলার গোগ্রাসে গিলছিলাম। অর্থাৎ নিজেদের তৈরি করছিলাম। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা সরকারের নির্দেশে প্রতিটি জেলায় জেলা শাসককে মাথায় বসিয়ে একটা ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেটিভ কমিটি (ডিসিসি) চালু হয়েছিল। ব্যাঙ্ক কর্তারা, উন্নয়ন দপ্তরগুলোর সরকারি অফিসাররা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পরে নাবার্ড ডিসিসির সদস্য ছিলেন। বস্তুত ১৯৬৯-এ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরে প্রতিটি জেলায় যে ব্যাঙ্কের গ্রামীণ এলাকায় শাখা সবচেয়ে বেশি তাদের লীড ব্যাঙ্কের দায়িত্ব দেওয়া হত।

কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, জল ও পথ পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহ ঋণ, শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিকে বলা হয় অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের ঋণ (প্রায়োরিটি সেক্টর)। এই ঋণের জন্য প্রতিটি ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা এবং সেই কাজকে সম্পন্ন করাতে লীড ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্টভাবে ক্যাপটেনের ভূমিকা পালন করতে হয়। সেই কারণে প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাঙ্ক অফিসার ও তার অফিসের ব্যবস্থা করা হয়। একই ভাবে রাজ্যস্তরে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি (এস.এল.বি.সি.) গঠিত হয়েছিল। নির্দেশ ছিল ৪০ শতাংশ ঋণ দিতে হবে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে।

*(এরপর আগামী সংখ্যায়)*

# ভোট এলেই মনে পড়ে প্রথম ভোটের সেই দিনটি

সত্যম ভট্টাচার্য

প্রতিবার ভোটের দামামা বাজলেই ভোটকর্মীদের মনে পূর্ববর্তী ভোটগ্রহণের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহ ঝলক দিয়ে ওঠে। তার মধ্যে কখনও যেমন থাকে ভয়ানক বিভীষিকাময় ভোটের আগের দিনের রাত ও ভোটের দিন, আবার তেমনই থাকে অনেক অজানা অচেনা মানুষের করে দেওয়া সাহায্যের সুখকর অভিজ্ঞতা। আর সকল ভোটকর্মীরই মনে ভীষণভাবে দাগ কেটে রয়ে যায় তার প্রথম ভোটপর্বটি।

চাকরি পাওয়া ইস্তকই স্কুলের টিচার্স কমনরুমে ভোটের কথা উঠলেই সিনিয়ররা তাদের করা ভোটের বিভিন্ন গল্প শোনাতেন। বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে সদ্য চাকরি পেয়েছি। জীবনের অভিজ্ঞতা বড়ই কম। প্রতিদিন ঠেকছি আর নতুন করে শিখছি। নিজের চারিদিকে বেশ একটা সরগরম ব্যাপার। এসবের মধ্যেই চিঠি চলে এল প্রথম নির্বাচনের। যথারীতি কমনরুম আরও আরও ভোটের গল্পে সরগরম হয়ে উঠল। আর এরমধ্যে বেশিরভাগই ভাল বা সুখের নয় এমন গল্প। যত শুনি ততই মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যায়। মনে মনে ভাবি, আমি কি করে উঠতে পারব এত এত সব কঠিন কাজকম্ম? দু-একজন কলিগ অবশ্য প্রবোধ দিয়ে বলেন, কোনও ব্যাপার নয়। নিজেকেই নিজে তখন বলি, তাই তো, সবাই পারলে আমি পারব না কেন। কলিগদের মুখে মুখে তখন ঘোরে সেভেনটিন এ বি, স্ট্যাটুইটারি নন

স্ট্যাটুইটারি, এইসব কথা। গুডমর্নিং এর বদলে তখন সম্ভাষণে এসবই। এভাবেই গুটিগুটি করে একদিন চলে এল প্রথম ভোটের প্রথম প্রশিক্ষণের দিন।

নির্দিষ্ট দিনে বাসে উঠতে গিয়েই হোঁচট খেলাম। সব বাসই আসছে এমন বোঝাই হয়ে যে তাতে পা রাখারই জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। আগের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, তাই বুঝতেই পারছি না কেন এত ভিড়। অনেকটা সময় পেরিয়ে বুঝতে ও শুনতে পেলাম যে ভোট প্রশিক্ষণের দিনে এমনই হয়। কোনওমতে একটি বাসে দাঁড়াবার জায়গা হল। প্রায় দু'ঘণ্টার কম বেশি সময়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে পৌঁছলাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ কেন্দ্রে। যতদূর মনে পড়ে সেবছর প্রথম প্রশিক্ষণের দিনই দলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা এভাবে হয় যে দলের সকলের একটি সাধারণ নাম্বার থাকে এবং তারপর প্রত্যেকের একটি নিজস্ব নম্বর থাকে। ফলতঃ নিজের জায়গা বা দলকে খুঁজে পেতে কোনওই অসুবিধা হয় না। এখন বলছি বটে অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রথমবার এই দুই নম্বর মিলিয়ে খুঁজে পেতে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। তা যাই হোক, অবশেষে জায়গা খুঁজে পেয়ে দেখলাম সেখানে আমার থেকে অনেক বয়স্ক লোকেরা গুরুগম্ভীর মুখে বসে আছেন। ততক্ষণে আবার প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই কারুর সাথেই তেমন পরিচয় হবার সুযোগ হল না। প্রশিক্ষণ যারা দিচ্ছিলেন তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলাম। প্রথম পর্বের প্রশিক্ষণের পর বেলা শেষে দলের অন্যদের সাথে পরিচয়ের শুভক্ষণ এল। নিজের পরিচয় দিয়ে জানালাম যে আমিই দলের প্রিসাইডিং অফিসার এবং এবারই আমার প্রথম ভোট। বয়স্ক

**নির্দিষ্ট দিনে বাসে উঠতে গিয়েই হোঁচট খেলাম। সব বাসই আসছে এমন বোঝাই হয়ে যে তাতে পা রাখারই জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। আগের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, তাই বুঝতেই পারছি না কেন এত ভিড়। অনেকটা সময় পেরিয়ে বুঝতে ও শুনতে পেলাম যে ভোট প্রশিক্ষণের দিনে এমনই হয়। কোনওমতে একটি বাসে দাঁড়াবার জায়গা হল। প্রায় দু'ঘণ্টার কম বেশি সময়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে পৌঁছলাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ কেন্দ্রে।**

ব্যক্তিরা শুনে প্রসন্ন হলেন না কি বিরক্ত হলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। কারণ সকলে বিরস বদনেই থাকলেন। তবে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক কারণ হাঁটুর বয়সী ছোকরার অধীনে ভোট করতে কারুরই ভাল লাগার কথা নয়। আর আমি স্কুলের সিনিয়রদের পরামর্শক্রমে তাদের সামনে সারেন্ডার করলাম এই বলে যে যেহেতু আমার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতাই নেই তাই সকলে মিলে কাজ ও আমাকে সাহায্য না করলে ভোট সফল ভাবে শেষ করে ফেরত আসা খুবই কঠিন ব্যাপার। আমার দলেরই একজন বয়স্ক বিদ্যালয় শিক্ষক, যিনি প্রায় অবসরের দোরগোড়ায়, জানালেন যে তিনি অনেক ভোট করেছেন এবং চিন্তার কোনও ব্যাপার নেই, তিনিই আমাকে গাইড করে দেবেন। আমি যথারীতি তার উপরই সকল ভরসা স্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বেশ কিছু উপদেশ দিলেন। যেমন বেশ কিছু প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে আসতে যার মধ্যে আলাদা আলাদা করে সব সাজিয়ে ফেলা যাবে ইত্যাদি।

**খানিকক্ষণ পর সেই একটু কালো মেঘ আর একটু না থেকে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলল। চারিদিক কালো করে এল। ঘরের ভেতর অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে ভোট চলতে লাগল। খানিকক্ষণ পর চারিদিক কাঁপিয়ে এমন কালবৈশাখী ঝড় এল যে গোটা ভোটপ্রক্রিয়াই বানচাল হয়ে যায় প্রায়। কোনওক্রমে সমস্ত কাগজপত্রের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে তাদের উড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালাম। মনে হল প্রচণ্ড হাওয়াতে ঘরের চালটাই না উড়ে যায়।**

চারিদিক ভোটের আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠল। আমরা কজন সহকর্মী, যাদের সে বছর প্রথম ভোট ছিল, তারা নিয়মিত মিলিত হয়ে কীভাবে কোন কাজ করতে হবে, তা নিয়ে আলোচনা করতাম। আস্তে আস্তে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, স্নায়ুর চাপও যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে ভোটের আগের দিন ভোরে লোটা কম্বল বেঁধে বাসে গিয়ে জায়গা নিলাম। কেবল ভোটকর্মীদেরই বাস। সে বাসে চলতে চলতে ভিড়ে এমন অবস্থা হল যে কোনও ভোটকর্মীই বিনা যুদ্ধে বাসের সূচাগ্র মেদিনী কাউকে ছাড়তে রাজি নন। এভাবেই একসময় পৌঁছে গেলাম ডিসিআরসিতে যা আসলে ভোটগ্রহণ সামগ্রী বিতরণ ও গ্রহণকেন্দ্র। দলের কেউই তখনও আসেন নি। ফোনে কথা হল, তারা আসছেন, সকলেই রাস্তায় আছেন। এক বিদ্যালয়ের মাঠে এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি। অনবরত সেখানে ঘোষণা হয়েই চলেছে। ভোটকর্মীরা দলে দলে উপস্থিত হচ্ছেন। কেউ আবার ইতস্তত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ সেখানে গাছের ছায়ায় চাদর পেতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কোথাও আবার একদল বসে গেছে তাস নিয়ে। সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিক শুনশান। শুধু কিছু অস্থায়ী ছাউনির হোটেল। সেখানে শুধু ভাতই পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই চারিদিক দেখতে দেখতে বেশ সময় কাটতে লাগল। ধীরে ধীরে যে সমস্ত দলের সব লোক চলে আসছে তারা ভোটের জিনিসপত্র নেওয়া ও মেলানো শুরু করে দিলেন। অনেক পরে আমার দলের সকলে যখন উপস্থিত হলেন ততক্ষণে দুপুর। তারপর তারা একজন ভাত খেতে চলে যান তো আরেকজন যান শৌচাগারে।

অনেক কষ্টে সকলকে এক করে ভোটকেন্দ্র বুঝে জিনিসপত্র মিলিয়ে নিয়ে, লাইন দিয়ে পুলিশ নিতে হল। তারপর আবার লাইন দিয়ে গাড়ি। গাড়ির নম্বর নিয়ে গাড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখি গোটা মাঠ জুড়ে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। সেখানে কোথায় আমার গাড়ি। এতো পুরো খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মত ব্যাপার। কিন্তু কী আর করা যাবে। শুরু হল গাড়ি খোঁজা। পেয়েও গেলাম একসময়, যদিও ততক্ষণে পুরো গলদঘর্ম। বাসে মোট তিনটে দল, আমরাই প্রথম, অতএব এবারে বাকিদের জন্য অপেক্ষা শুরু হল। তারা এলে, রওনা দিয়ে যখন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছলাম ততক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামছে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র একটি প্রাইমারি স্কুল, দরমার বেড়া, ধরে রাখতে হয় এমন শৌচাগারের দরজা তার। গ্রামে তখন ধীরে ধীরে রাত ঘন হচ্ছে। নিশুতি অন্ধকার চারিদিকে। দূরে কোনও কোনও বাড়িতে টিমটিমে হলদে বাল্বের আলো জ্বলছে। কনে দেখার মত করে গোটা গ্রাম আমাদের দেখতে এল। সে বাচ্চা কোলে ঘোমটা দেওয়া বউ থেকে শুরু করে বৃদ্ধা মহিলা অব্দি। ছেলে ছোকরারা তো আছেই। ঘরে আলোর কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। পাশের ঘরেই আর একটি বুথ। একজন চটপটে ভদ্রলোক ছিলেন সে দলে। তিনিই দেখলাম আমাদের দু'ঘরের জন্যই আলো, টিফিন-চা, রাতের ও পরের দিনের ভাত খাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

এ সমস্ত কাজকম্ম চলছে। এবারে সেই যে আমার দলের বয়স্ক শিক্ষক ভদ্রলোক আমাকে কানে কানে বললেন, স্যার চলুন, আপনাকে তো এবারে কাজে বসতে হবে। বললাম, বসবো তো, চা-টা খাই। উনি বললেন, চা-টা বাদ দিন, না হলে কিন্তু পরে সময় পাবেন না। অবাক হয়ে গেলাম। কাজে বসলাম ওনার সাথে। উনি আমাকে নিয়ে বসে প্যাকেট খুলে সব ফর্ম ও তার নির্দিষ্ট খামে আলাদা আলাদা প্যাকেটে ঢুকিয়ে দিলেন আর কিছু তথ্য একটা কাগজে লিখে দিয়ে বললেন, এগুলোই সব ফর্মে লিখতে হবে। কাজ শুরু করলাম। রাতের খাবার চলে এল এর মধ্যেই। খেয়ে দেয়ে সবাই যখন বিছানা করে শোবেন, কেউ নীচে কেউ বা আবার স্কুলের বেঞ্চে, আমার কাজ তখনও দশভাগই এগোয় নি। এবারে সেই দাদা বললেন, যতটা পারবেন ব্যালট সই করে রাখবেন। চমকে উঠে বললাম, মানে? বললেন-পঞ্চায়েত ভোট তো। ব্যালটে আপনার সই আর সিল লাগবে। সিল আমি করে দিয়েছি। আপনি সই করে শোবেন। সবাই ঠিক করলেন ভোর পাঁচটায় উঠবেন। আমি কাজ করে চললাম ঠায় বসে।

মধ্যরাত অনেকক্ষণ হল পেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন বিচিত্র শব্দে আমার দলের লোকেরা তাদের নাসিকা গর্জনের দ্বারা আমাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। শুধু আমার ঘরেরই নয়। পাশের ঘর থেকেও ভেসে আসছে বহুবিধ নাসিকা গর্জনের আওয়াজ। অনেক কষ্ট করে সই এর পর সই করে চলার চেষ্টা করছি। তবে সেটা যে কার সই হচ্ছে নাকি আদৌ কিছু হচ্ছে বা হচ্ছে না, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। সময় কত পেরিয়ে গেছে জানি না। শুনলাম আশপাশের কোনও বাড়ি থেকে কুক্কুট তারস্বরে প্রহর ঘোষণা করল। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ছোট কাঁটা চারটের ঘরে পৌঁছে গেছে। ভাবলাম একটু শুতে হবেই, না হলে পরদিন সারাদিন কাজ করে উঠতে পারব না। বাইরে গোটা মাঠ জুড়ে লোকজনের চাপা কথাবার্তার আওয়াজ তাড়াহুড়ো করে বাইরে এসে দেখি মাঠের একদিকে আগুন জ্বলছে। বাতাসে মাংসের সুঘ্রাণ। কিছুই বুঝতে পারছি না। বারান্দা থেকে নামতেই এক উর্দিধারী পুলিশকর্মী এগিয়ে এলেন। খাবি খেলাম পুলিশ দেখেই। যখন স্যার সম্ভাষণ করলেন আরও থতমত খেয়ে গেলাম। নিজেকে কোনওমতে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি? তিনি বললেন যে তারা কজন আমার বুথে পোস্টেড হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী হচ্ছে গোটা মাঠ জুড়ে? উত্তরে তিনি যা বললেন শুনে মাথা ঘুরে গেল। গোটা গ্রামকে নাকি ভোজ খাওয়ানো হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করলাম।

দরজায় ঠকঠক আওয়াজ। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখি বাইরে আলো ফুটে গেছে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে আলো ঘরে উঁকি দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি। আমার হাতে একটা আইডেনটিটি কার্ড ধরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন যে তিনিই আমার বুথের পোলিং এজেন্ট। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে তাকে বললাম অপেক্ষা করতে। আবার কিছু লোক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। জানতে চাইলাম। সমস্বরে উত্তর এল— ভোট দিয়ে কাজে যাব। এবারে আর গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না। কাজ শুরু করলাম। কোনটা আগে আর কোনটা পরে করব তাই বুঝে উঠতে পারি না। একবার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গুছাই, তো আর একবার নিজের প্রাত্যহিক কাজকম্ম করতে দৌড়ই। এরই মধ্যে দেখি আমার দলেরই এক কর্মী আয়না, রেজার, ব্লেড এসব নিয়ে দাড়ি কাটতে বসেছেন। দেখে রাগ করব না হেসে উঠব বুঝে উঠতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে লাইন লম্বা হতে শুরু করেছে। আর একদিকে আমি আর সহকর্মীরা টিউবওয়েলে স্নান সারছি বা হাতে জলের বালতি নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছি।

যাই হোক, কীভাবে কীভাবে যেন একসময় ভোট চালু হয়ে গেল। একদিকের বেঞ্চে পোলিং এজেন্টরা, দরজার মুখোমুখি আমার দলের কর্মীরা, আরেকদিকে ভোটিং কক্ষ, আর আমি টেবিলে রাজ্যের কাগজপত্র নিয়ে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে গোটা ভোট প্রক্রিয়া ভালমত লক্ষ্য করা যায়। বুঝলাম গোটা ঘরে আমিই সর্বকনিষ্ঠ ও ভোটের অভিজ্ঞতাবিহীন। ভোট চলতে লাগল ভাল মতই। খানিকপর চা-জলখাবারের রুটি এসব এল। পোলিং এজেন্ট যারা আছেন বিভিন্ন দলের তাদেরও চা দিতে বলা হয়েছে। তাদের নাকি সন্তুষ্ট রাখতেই হবে কারণ তাদের উপরই নির্ভর করবে ভোটপ্রক্রিয়া কতটা শান্তিপূর্ণ হল। গোটা সময় জুড়েই তাদের তোসামোদ করে চলতে হবে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণের জন্য।

বেলা গড়াল। ঠিক হয়েছে দুপুরে পাশের যে বাড়িতে খাবার বন্দোবস্ত সেখানে একজন একজন করে গিয়ে খাবে। প্রথমে আমার দলের লোকেরা গিয়ে খেয়ে আসবে। আর যখন যে অনুপস্থিত থাকবে তার কাজ আমি চালাব। আমার খাবার দিয়ে যাবে। সবই চলছে ঠিকঠাক। কতরকমের লোক দেখছি। নুব্জ্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা, শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষম তাদেরকে যেমন নিয়ে আসা হচ্ছে তেমনই বাচ্চা কোলে নিয়ে ভোট দিতে আসছেন গ্রামের গৃহবধূটি। দরমার বেড়ার ঘরে অনবরত উঁকি দিয়ে চলেছে ছেলে ছোকরার দল। খুব একটা বেশি চাপ নেই। কিন্তু ভোটার তো অনেক। কোথায় তারা? সেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দাদা বললেন যে পুরো ভিড়টা বিকেলে হবে। সবাই খেয়ে আসবার পর একটা থালায় সুন্দর পরিপাটি সাজিয়ে আমার খাবার এল। হাতটাত ধুয়ে এসে ঘরেরই এককোণায় দাঁড়িয়ে দু'গ্রাস মুখে দিয়েছি, একখানা গাড়ি এসে বাইরে দাঁড়াল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বুথে বুথে ভিজিট করছেন। ভাতের থালা রেখে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। তারা দেখলেন সব ভাল করে। বিদায় নিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক ভোটার এসে বললেন তিনি ভোট দেন নি, অথচ তার ভোট পড়ে গেছে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল গন্ডগোল। এ বলে চ্যালেঞ্জ ভোট হবে ও বলে টেন্ডার ভোট হবে। কোনওক্রমে অনেক চেষ্টা করে গন্ডগোল থামানো গেল। খাওয়া আর হল না। বাইরে হাত ধুতে গিয়ে দেখলাম আকাশে একটু একটু কালো মেঘের ঘনঘটা।

খানিকক্ষণ পর সেই একটু কালো মেঘ আর একটু না থেকে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলল। চারিদিক কালো করে এল। ঘরের ভেতর অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে ভোট চলতে লাগল। খানিকক্ষণ পর চারিদিক কাঁপিয়ে এমন কালবৈশাখী ঝড় এল যে গোটা ভোটপ্রক্রিয়াই বানচাল হয়ে যায় প্রায়। কোনওক্রমে সমস্ত কাগজপত্রের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে তাদের উড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালাম। মনে হল প্রচণ্ড হাওয়াতে ঘরের চালটাই না উড়ে যায়। দরমার বেড়ার ঘর হাওয়ায় দুলতে লাগল। এরপর শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি। ভাগ্যিস ছাতা ছিল সাথে। ছাতা খুলে রেখে দিলাম কাগজপত্রের ওপর। ভোটগ্রহণ বন্ধ। গোটা মাঠ জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা জনতা তখন উঠে এসেছে ঘরের বাইরের ছোট্ট বারান্দায়। এমন চাপ পড়ছে সেদিকের দরমার বেড়ায় যে মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে এই তাণ্ডব চলে যখন চারিদিক ঠান্ডা হল, মাঠে তখন হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। তার মধ্যেই শয়ে শয়ে লোক এসে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে লাগল। কে যেন বলল কিউ স্লিপ দিতে হবে। কী সেটা? টনক নড়ল। সেটা তো রেডি করাই হয় নি। সিল সই দিয়ে রেডি করতে হবে। দরজায় যে ছেলেটি গার্ড হিসেবে নিয়োগ হয়েছিল ও বলল, দিন স্যার আমি করে দিচ্ছি। ও কাগজ কেটে রেডি করে দিল সিল দিয়ে। পাঁচমিনিট আগে ঘোষণা করে বললাম সকলকে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তে। তারপর একদম শেষের জনকে একনম্বর দিয়ে এগোতে লাগলাম। যতদূর মনে পরে তিনশর মত কিউস্লিপ দিতে হয়েছিল। একজন বন্দুকধারী পুলিশভাই এসে আমাকে অনেকটাই সাহায্য করলেন। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে

দেখতে পেলাম গোটা মাঠ জুড়ে কুপির আলো জ্বালিয়ে মেলার মত বসে গেছে। আমারও ইচ্ছে করছিল একটু ঘুরে আসি সেখান থেকে। কিন্তু দায়িত্ব বড়ই বালাই। ভোট শেষ হল রাত প্রায় দশটার আশপাশে। ঘরের বাইরে এলাম। মাঠে তখন আলো লোকজন কিছুই আর নেই। গোটা মাঠ জুড়ে শুধু জোনাকি আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। এবারে সব কাগজপত্রের কাজ নিয়ে বসতে হবে ও কাজ শেষে পোলিং এজেন্টদের হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে।

আনুমানিক রাত প্রায় বারোটা নাগাদ সমস্ত কাগজপত্রের কাজ সাঙ্গ করে আমরা ও আমাদের পাশের বুথের লোকজন গাড়িতে চেপে বসলাম। গোটা গ্রাম তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাছেই ফরেস্ট। গা ছমছম করা রাস্তায় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় এবড়োখেবড়ো পথে দেখে শুনে ড্রাইভার সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে লাগল। মহাকালবাবা আবার না এসে পড়ে পথের ওপর। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে কারুর মুখে কোনও কথা নেই। আমার দলের তিনজন তিনটে ব্যালট বাক্স কোলে জড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। আমার কাছে সব কাগজপত্রের হিসেব। এক একবার করে ঘুমে ঢলে পড়ছি আবার গাড়ির ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে আসছে। পথে আরও একটি দল গাড়িতে উঠবে। বেশ খানিকক্ষণ চলার পর গাড়ি আর একটি স্কুলের মাঠে প্রবেশ করলো। এখানেও চারিদিক অন্ধকার, কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার বলল, খুঁজে দেখুন, না হলে তো যাওয়া যাবে না। খানিক পর ঠাহর করে বোঝা গেল দূরে একটি ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। কজন মিলে পায়ে পায়ে এগোলাম সেদিকে। গিয়ে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে বিরক্তির পারদ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছল। একটা বড় টেবিল জুড়ে কাগজপত্র খাম সব লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে। বোঝা গেল ভোট সম্পন্ন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রিসাইডিং অফিসার আর দলের লোকেরা মিলে কোনও কাগজপত্রই গুছিয়ে উঠতে পারেন নি। আর তখন ঐ মোমবাতির আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখে মনে হল দলের বাকিদের সাথে প্রিসাইডিং অফিসারের কিছু গন্ডগোল হয়েছে। তাই তারা চেয়ারে বসে কেউ গল্প করছে, কেউ ঝিমুচ্ছে। আর প্রিসাইডিং অফিসার টেবিলের চারপাশে উদভ্রান্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছেন আর স্বাভাবিকভাবেই কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছেন না।

আমাকে আমার পাশের বুথের প্রিসাইডিং অফিসার বোঝালেন যে এই মুহূর্তে ঐ প্রিসাইডিং অফিসারকে মিথ্যা প্রবোধ না দিলে এ রাতে আমাদের নিস্তার নেই। সেই ক্লান্ত বিধ্বস্ত প্রিসাইডিং অফিসারকে বোঝানো হল যে এখানে যেহেতু আলো নেই তাই ডিসিআরসিতে চলুন, সেখানে আলোয় বসে আমরা সব কাজ করে দেব। তিনি নিমরাজি হলেন। সব গুটিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে এল সেই দল। আর আমরা হাঁফ ছেড়ে রওনা দিলাম।

গাড়ি প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর পৌঁছল ডিসিআরসিতে। সেখানে তখন গোটা মাঠ জুড়ে জল কাদা গাড়ি, আর মাইকে অনবরত ঘোষণা হয়েই চলেছে। সবাই সেখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কেউ জমা দিতে কেউ বা আবার জমা দিয়ে গাড়ি ধরতে। আমরাও দৌড়লাম। ফ্যালফ্যাল চেয়ে পড়ে থাকলেন সেই প্রিসাইডিং অফিসার যাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে জমা দেবার লাইনে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে পুব আকাশে অন্ধকার কেটে গিয়ে লাল আলোর আভা উঁকি দিচ্ছে। কাগজপত্র ঠিকই ছিল, তাই যারা জমা নিচ্ছিলেন তারা একটু গাঁইগুঁই করলেও জমা দিতে দেরি হল না। জমা দেবার পর নিজের কাগজে যেমন রিলিসড লিখিয়ে নিলাম, তেমনই আমাকে আমার দলের অন্যদের কাগজে সেটাই লিখে দিতে হল। করমর্দন করলাম ও সবাইকে ধন্যবাদ জানালাম, সফলভাবে কাজ শেষ করতে পারার জন্য। একটা অন্যরকম ভাললাগার অনুভুতি হচ্ছিল। এবারে বাসের খোঁজ করতে হবে। ঘোষণা চলছে অত অত নম্বরের বাস ওখান থেকে ছেড়ে অমুক অমুক জায়গা পেরিয়ে অমুক জায়গায় যাবে। পেয়েও গেলাম আমার গন্তব্যের বাস। উঠে পড়লাম। প্রায় ফাঁকা বাস, ঝড়ের গতিতে ছুটল। উঠেই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল বাড়ির স্টপেজের খুব কাছাকাছি। অনেকটা সময় কেটে গেছে মাঝে। এবারে আর ঘুমোনো যাবে না। নামতে হবে। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

*(ছবিগুলি আন্তর্জাল হইতে সংগৃহীত।)*

# মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

## (১৪ অক্টোবর ১৯৩০ - ৪ সেপ্টেম্বর ২০১২)

**জাহির রায়হান**

'ওই বয়সে মা'র মৃত্যু হলো, কিন্তু এই মৃত্যু আমাকে ছুঁলো না। প্রকৃতি আমাকে কেড়ে নিয়েছেন কবে, আমার আসল মা যে তিনিই! আশ্চর্য নির্বিকার থেকে গেলাম'— এ কথা লিখেছেন স্বয়ং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

প্রকৃতিই ছিল তাঁর সাধের চারণভূমি। দ্বারকা নদীর অববাহিকায় হিজল ও তার নারী-পুরুষ এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত ক্যানভাস ছিল তাঁর জীবন জুড়ে। রাখাল বালকের সাথে মাঠে মাঠে, হিজলের বিলে, ঘাসবন ও উলুখড়ের জঙ্গলের মায়াময় আদিম স্যাঁতসেঁতে জগতেই খুঁজে পেতেন নিজেকে তিনি। গাছপালা, লতাপাতা, রংবেরং-এর পাখি ও প্রজাপতি নিয়ে মেতে থাকতেন সারাক্ষণ। জন্মদাত্রী মায়ের অকালমৃত্যুর পরও তাই তিনি আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত, তাঁর জন্য যে বিছানো রয়েছে প্রকৃতি মায়ের আঁচল।

মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্মভিটে। পিতা সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী ছিলেন জ্ঞানী মানুষ, যোগ দিয়েছিলেন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে। মা আনোয়ারা বেগমের ছিল সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। নিয়মিত লিখতেন কবিতা ও গল্প। সিরাজ যখন নয় বছরের বালক, ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। মাসী একলিমা বেগম হলেন নতুন মা। দিদির মত তাঁরও ছিল সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা। হয়ত মা ও নতুন মায়ের সাহিত্যপ্রীতিই ছিল সিরাজকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে। সাহিত্যচর্চা যেন ছিল তাঁদের রক্তে। দু'পক্ষ মিলে আট জন ভাই ছিলেন সিরাজরা, এবং সকলেই ভালবাসতেন দেশ-বিদেশের সাহিত্য। সিরাজের স্ত্রী হাসনে আরা বেগম রচনা করেছিলেন কাব্যগ্রন্থ 'লাল শিমুলের দিন'।

কৈশোরে পালিয়ে বেড়াতেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। রাঢ় বাংলার লোকনাট্য আলকাপের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। আলকাপ দলের সাথে যুক্ত হয়ে নাচ-গান-অভিনয়ে অংশ নিয়ে ঘুরেছেন জেলায় জেলায়। তিনি ছিলেন দলের 'ওস্তাদ' বা নাচ-গানের প্রশিক্ষক। আবার কখনও কখনও পেট্রোম্যাক্স বা হ্যাজাগের আলোয় বসে বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে মাত করতেন আলকাপের আসর। নিজের দল নিয়ে চরকির মত ঘুরেছেন সারা পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি পাশের রাজ্যগুলিতেও।

পিতার সঙ্গে বর্ধমানের নবগ্রাম রেল স্টেশনের

কাছে বাস করেছেন কিছুদিন। সেখানে গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। নবগ্রাম-গোপালপুরের প্রেক্ষাপট উল্লেখ আছে তাঁর 'প্রেমের প্রথম পাঠ' উপন্যাসে। গোপালপুর থেকে পাশ করে তিনি ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। ১৯৫০ সালে স্নাতক হয়ে মেদিনীপুরের পানিপারুলে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন বেশ কিছুদিন। ষাটের দশকের শুরুতে কলকাতাবাসী হন মুস্তাফা সিরাজ। সহ-সম্পাদনা করেন কলকাতার 'ইত্তেফাক' পত্রিকা। পরবর্তীতে আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাংবাদিকতা ও লেখালেখি চালিয়ে গেছেন সমান তালে। তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান, পান্ডিত্য এবং প্রগতিশীল মুক্তচিন্তা তাঁকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বিদ্বসমাজে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ছিল তাঁর পর্যাপ্ত পড়াশোনা।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে একঝাঁক লেখক সাহিত্যিক উদিত হন বাংলা সাহিত্যের আকাশে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যশোদাজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি নন্দী প্রমুখ। এঁদেরই সঙ্গে ঘটে সিরাজের আত্মপ্রকাশ। তবে সিরাজ ছিলেন একটু ভিন্ন ধাঁচের কথাসাহিত্যিক। তাঁর গল্প-উপন্যাসের পরতে পরতে সজ্জিত রয়েছে নিজস্ব মেঠো অভিজ্ঞতা, গ্রামবাংলার চালচিত্র, সামাজিক দর্পণ ও গ্রামীণ জনমানসের নিখুঁত চারিত্রিক বর্ণনা। ফলে অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা সেইসব সৃষ্টিকর্মে দেখতে পান অন্তরাত্মার জলছবি।

আপনভোলা মুস্তাফা সিরাজের লেখক সত্তা রাঢ়ের রুক্ষ মাটি দ্বারা লালিত। বাঙালি পাঠকের দরবারে আজও সমান সমাদৃত তাঁর অনন্য সব শিল্পকর্ম। তাঁর 'ইন্তি, পিসি ও ঘাটবাবু', 'ভালবাসা ও ডাউনট্রেন', 'তরঙ্গিনীর চোখ', 'জল সাপ ভালবাসা', 'হিজল বিলের রাখালেরা', 'রণভূমি', 'উড়োপাখির ছায়া', 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি তুমুল জনপ্রিয় ছোটগল্প। 'নীলঘরের নটী' তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। 'পিঞ্জর সোহাগিনী', 'কিংবদন্তির নায়ক', 'হিজলকন্যা', 'আশমানতারা', 'উত্তর জাহ্নবী', 'নিশিমৃগয়া', 'নিশিলতা', 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', 'রোডসাহেব',

*সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ*

ইত্যাদি পর পর প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাস 'অলীক মানুষ' তাঁকে উন্নীত করেছে ভিন্ন ধারার লেখক মর্যাদার চূড়ান্ত শিখরে। উপন্যাসটি ভারত সরকারের 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়। পাশাপাশি লাভ করে রাজ্য সরকারের বঙ্কিম পুরস্কারও। তাঁর গল্প ও একাধিক উপন্যাস অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্বীকৃত ভাষায়।

ক্ষুদে ও কিশোর পাঠকদের দাবি মেটাতে তাঁর সৃষ্টি গোয়েন্দা কর্নেল। পুরো নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার। মাথা জোড়া টাক, ঠোঁটে চুরুট, ভালবাসেন পাখি ও প্রজাপতি। নিজের পরিচয় দেন প্রকৃতিপ্রেমিক হিসেবে। আবার স্বইচ্ছায় শখের গোয়েন্দাগিরি করে বহু অপরাধ, হত্যা ও রহস্যের কিনারা করেন অবলীলায়। পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র গোয়েন্দা কর্নেল। পরিণতমনস্ক পাঠকদের জন্য সিরাজ সৃষ্টি করেন 'ইনস্পেকটর ব্রহ্ম' নামে আরও একটি গোয়েন্দা চরিত্র।

অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি আজীবন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নরসিংহদাস স্মৃতি পুরস্কার। আনন্দ পুরস্কার। বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার,

সুশীলা দেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ইত্যাদি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্কুল পালানো সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর রচিত অনেক কাহিনী হয়েছে চলচ্চিত্রায়িত, 'কামনার সুখ দুঃখ' উপন্যাস অবলম্বনে 'শঙ্খবিষ'। দীনেন গুপ্তের পরিচালনায় 'নিশিমৃগয়া'। মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত 'আনন্দমেলা'। 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' অবলম্বনে 'অন্বেষণ'। 'মানুষ ভূত' কাহিনী চলচ্চিত্রের পাশাপাশি নাট্য মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে বহুবার।

ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যিক সিরাজ ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের অধিকারী। সংবাদপত্রে চাকরি করেছেন সসম্মানে। নামকরা পত্রিকায় চাকরি করলেও তাঁর সেরা উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয় নানাবিধ অখ্যাত পত্র-পত্রিকায়। 'চতুরঙ্গ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'অলীক মানুষ'। 'তৃণভূমি' প্রকাশ পায় অধুনালুপ্ত 'ধ্বনি' পত্রিকার পাতায়। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ সহানুভূতিশীল। মিডিয়ার আলো ও প্রচারের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নির্মোহ। পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের সম্পর্ক। ব্যবহার ও আচরণে লক্ষিত হত পরিশীলিত ভদ্রতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ।

কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনযাপন ছিল অগোছালো। স্বভাবগতভাবে উড়নচণ্ডী এবং প্রকৃতি প্রেমিক হওয়ায় কংক্রীট সভ্যতার প্রাত্যহিকী হতে পারে নি তাঁর প্রাণের খোরাক। কলকাতায় বাস করলেও মন পড়ে থাকত গ্রাম এবং হিজলের উদার প্রকৃতি-প্রান্তরে। নিজেকে তিনি ভাবতেন কলকাতাবাসী প্রবাসী। তাই সামান্য সুযোগেই বারবার ছুটে যেতেন মুর্শিদাবাদের গ্রামে। তাঁর প্রায় প্রতিটা উপন্যাসেই পাওয়া যায় রাঢ়-বাংলার অকৃত্রিম নিসর্গের প্রতিচ্ছবি এবং প্রান্তিক মানুষের বিচিত্র জীবনধারার স্পষ্ট পরিচয়। আশৈশব তিনি অপছন্দ করতেন বদ্ধতা এবং নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন জটিল ও কৃত্রিম জগত থেকে দূরে। তাঁর সৃষ্ট কিশোর সাহিত্যকর্মগুলি আসলে আজন্মলালিত ভাবুক পৃথিবীর বহুমাত্রিক বহিঃপ্রকাশ।

## আমাদের বইপত্র

# পঞ্চাশে ৫০

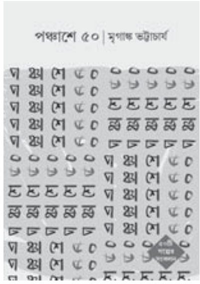


প্রেম থেকে পাপ,
প্রকৃতি থেকে
অতিপ্রাকৃত অনুভূতি—
সবক'টি বিষয়ে
লেখনীর অনায়াস যাত্রা

### রাজশ্রী বসু অধিকারী

প্রচ্ছদটি আধুনিক। পঞ্চাশটি ছোটগল্প নিয়ে ফুলের তোড়ার মতো সাজানো হয়েছে বইটি। মৃগাঙ্কর লেখা পড়ে আমার সবচেয়ে প্রথমেই যেটা মনে হয়েছে, যেন একটা শব্দের সমুদ্রে ডুবে থাকে ও লেখার সময়। কোথাও কোনও তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই, একটু একটু করে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো করে খুলে যায় গল্পের সুনির্দিষ্ট গতিপথ।

স্পষ্ট সাবলীল ভাষায় লেখা প্রতিটি গল্প ভিন্ন স্বাদের। প্রেম থেকে পাপ, প্রকৃতি থেকে অতিপ্রাকৃত অনুভূতি সবক'টি বিষয়ের দরজায় দরজায় মৃগাঙ্কর লেখনীর অনায়াস যাত্রা সুরুচিশীল পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করবেই। এই বইটিতে খুব বেশিমাত্রায় ভাল লাগা গল্পগুলোকে বেছে আলাদা করা সম্ভব নয়। সব গল্পই ভাল, ভীষণ ভাল। তবু তার মধ্যেই অপেক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্ধকারের নদী, গোধূলি মানুষ— এই গল্পগুলোর কথা উল্লেখ না করে পারা যাবে না। সব তো লেখা সম্ভব নয়, প্রতিটি গল্পের মধ্যে বিশেষত্ব হল অতি নিখুঁত তথ্যমূলক বর্ণনা। যারা সাহিত্যের মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী তাদের জন্য মৃগাঙ্কর এই গল্প সংকলন অবশ্যপাঠ্য। সব মিলিয়ে আমার কাছে এক অপার সুখানুভূতি নিয়ে এসেছে ছোটগল্পের এই ডালি।

**পঞ্চাশে ৫০**। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। এখন ডুয়ার্স। মূল্য ২৫০ টাকা।

# বাইকে বরফের খোঁজে উত্তরে

## প্লাস ছয় থেকে মাইনাস ছয়ের পথে

**নীলাঞ্জন মিস্ত্রী**

ডিসেম্বর মাস সবে শুরু হয়েছে তখন। অনুমতি নাও মিলতে পারে সেটা মন থেকে মেনে নিয়েই সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম গ্যাংটক। সিকিম সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে কাগজপত্র জমা দিলাম কাউন্টারে। 'এস্ত টাইম মা বাইক লিয়ারো গুরুদংমার? আম্মা আম্মা হো'। যার ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়— 'এই অসময়ে বাইক নিয়ে গুরুদংমার? বলে কি'? আধিকারিকদের মুখের ভূগোল দেখে নিরাশ হয়ে গেলাম। বুঝলাম এ যাত্রায় আর হচ্ছে না। পার্টনার কে.ডি. তখনও আশা হারায় নি। কোনও এক বিশ্বাস বলে বলেই চলল, 'হয়ে যাবে বস। টেনশন নিও না'। অপেক্ষা করতে থাকলাম আমরা। অবশেষে ডাক পড়ল আমাদের। তীব্র অনিশ্চয়তা নিয়ে অফিসে প্রবেশ করলাম। টেবিলের ওপাশে থাকা মহিলা অফিসার কিছু খাম দিয়ে বললেন, —'তপাইহরু লক্কি হুনহুনছ হ্যায়। তপাইহরু ইও

সিজনকো লাস্ট ট্রাভেলার্স হো'। অর্থাৎ— 'আপনারা খুব ভাগ্যবান। আপনারাই এই মরশুমের শেষ ট্রাভেলার'।

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। গ্যাংটক থেকে ১২১ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র সমতল থেকে ৯,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ি জনপদ 'লাচেন' পৌঁছাতে হবে আজ। বাইক যত এগিয়ে চলল রাস্তা তত কঠিন থেকে কঠিনতর হতে শুরু করল। ধ্বসকবলিত রাস্তা, সঙ্কীর্ণ পথ, রাস্তায় জমে থাকা জলকাদা, পাথর আর অসংখ্য ইউটার্ন আমাদের বাইকের গতি অনেকটাই কমিয়ে দিল। ঘণ্টায় ১৫-২০ কিলোমিটার গতিবেগে একে একে পেরিয়ে যেতে লাগলাম ফোডং, টঙ্গের মত ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য মাখানো পাহাড়ি সব জনপদ। মঙ্গনে পৌঁছে আমাদেরকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হল। সামনে রাস্তা নেই বললেই চলে। যত দূর চোখ গেল রাস্তার ওপর পাহাড় ভেঙে পড়ার দৃশ্যই শুধু নজরে এল। একটু দূরেই আছড়ে পড়ছে উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার জলরাশি। জনমানবহীন এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে এবার আমরা থামতে বাধ্য হলাম। এ ধ্বস যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা অনুমান করতে পারছিলাম না। তাই অগত্যা অপেক্ষা করতে লাগলাম স্থানীয় কোনও সাহায্যের। আমরা বাইক নিয়ে ওপারে যেতে চাই শোনার সাথে সাথেই তাদের উপদেশ, 'মাথি বড়া ঢুঙ্গা ঝরি রাক ছ। ন ঝাদাই রামরো হুনছ। তপাই হরু ফোরকিনোহোস'... পাহাড় থেকে এখনও পাথর পড়ছে। না যাওয়াই ভাল। আপনারা বাড়ি ফিরে যান। বুঝতে পারলাম কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবার আমাদের। ফিরে এলাম আমরা বাইকের কাছে। কোনওরকম ভাবনা চিন্তা না করেই বাইকে স্টার্ট। না পেছনে নয় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শুধুমাত্র ঝুঁকি, সাহস, রোমাঞ্চ আর মনের অদম্য ইচ্ছা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে যেন বলছিল— 'আগে বারো মেরে দোস্তো। কিঁউকি ডর কে আগে জিত হ্যায়'। অবশেষে আমরা সেফ জোনে। এই দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত স্থান অতিক্রম করতে কখন যে দুই ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে তা এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একবারও মাথায় আসে নি।

আর বেশি দেরি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অফলাইন গুগল ম্যাপ বলছে আরও ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে আমাদের। তারপরেই

পৌঁছতে পারবো ‘লাচেন’। ঘড়িতে সময় এখন দুপুর ১টা। পেটে ক্ষিদে যথেষ্টই। কিন্তু জলকাদা মাখানো স্যাডলার ব্যাগ খুলে ড্রাই ফুড বের করবার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। জনমানব শূন্য এপথে খাবার মিলবে কি না তা না জেনেই আবার যাত্রা শুরু হল। রাস্তায় নতুনত্ব কিছুই নেই। পিচহীন ছোটবড় পাথর মেশানো শর্পিল জিগজ্যাগ। চড়াই আর উৎরাই। এই পথ বেয়েই এগিয়ে চলেছি আমরা। যত উপরে উঠছি চারপাশটাও দ্রুত বদলে যেতে লাগল। গাছপালার বদলে যাওয়া রঙ, পাহারের বদলে যাওয়া রঙ, বুঝিয়ে দিল সমুদ্র সমতল থেকে অনেকটা উপরে এখন আমরা। এবার কিন্তু পেটের সাথে যুদ্ধ করে আর পারছিলাম না। পাহাড়ের এক ভয়ঙ্কর বাঁকে ছোট্ট একটি ঝুপড়ি, আর তার সামনে রাখা কিছু কাচের জার দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। চা মিলে গেল খুব সহজেই। তবে তার সাথে বাড়তি পাওনা ‘ফালে’। এই উচ্চতা আর এই দুর্গমতার বাঁকে বসে চা সহযোগে গরম গরম ফালের স্বাদ নেওয়ার অনুভূতি বোধকরি বাইক নিয়ে এপথে এলেই মিলতে পারে।

কাজর, সিঙ্গিক, সিনটাম, মানুল, মিয়ং, নাগাফলস, প্যায়েগাম। এক এক করে পেরিয়ে এসেছি সব। এবার সামনে ভয়াভহ ‘টুং’। থামানো হল বাইক। স্টার্টিং অবস্থাতেই কে.ডি. বাইকে বসে থাকল। বাইক থেকে নেমেই ছবি তুলতে লাগলাম হাড়হিম করা সেই রাস্তার। এ রাস্তার তিনদিকেই পাহাড়ের আচ্ছাদন আর ডানদিকটা একেবারেই খোলা। ডানদিকে গভীর খাদ অথচ কোনও রেলিং নেই। কয়েকশ ফিট নিচে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বয়ে চলেছে ভয়াল তিস্তা। সুতীব্র গর্জনের সাথে তার নীলসবুজ মাখানো জলরাশি একটু হলেও আপনার হৃদকম্প বাড়াবেই। সবে দু’ তিনটি ছবি তুলেছি পেছন থেকে আসা দুই বাইক আরোহী চিৎকার করে বলে দিয়ে গেল, ‘চলতে থাকুন। চলতে থাকুন। এখানে দাঁড়াবেন না। মারা পড়বেন’। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ কয়েকটি বড় পাথরের চাঁই আমাদের থেকে কয়েক হাত দূরেই রাস্তার উপর আছড়ে পড়ল। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে পড়লাম বাইকে।

চুংথাং থেকে রাস্তা দু’দিকে ভাগ হয়ে গেছে। ওয়াই কানেকশনের ডানদিকে লাচুং, ইয়ুমথাং ভ্যালি, জিরো পয়েন্ট, কাটাও এর মত দর্শনীয় স্থানগুলি আর বাঁদিকে লাচেন, থাঙ্গু ভ্যালি, কালাপাহার, চোপতা, গুরুদংমার লেক অথবা সো লা মু লেকের মত পৃথিবী বিখ্যাত স্থানগুলি। যদিও গুরুদংমার লেক অথবা সোলামু লেকের মত দর্শনীয় স্থানগুলিতে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা বাঁদিকের পথ ধরলাম। উচ্চতা যত বাড়ছিল ঠান্ডাও বেশ বেড়ে চলছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। দূরে পাহাড়ের উপর সাদা পুঞ্জীভূত মেঘের ভেতর থেকে উঁকি মারা

**কাজর, সিঙ্গিক, সিনটাম, মানুল, মিয়ং, নাগাফলস, প্যায়েগাম। এক এক করে পেরিয়ে এসেছি সব। এবার সামনে ভয়াভহ ‘টুং’। থামানো হল বাইক। স্টার্টিং অবস্থাতেই কে.ডি. বাইকে বসে থাকল। বাইক থেকে নেমেই ছবি তুলতে লাগলাম হাড়হিম করা সেই রাস্তার। এ রাস্তার তিনদিকেই পাহাড়ের আচ্ছাদন আর ডানদিকটা একেবারেই খোলা। ডানদিকে গভীর খাদ অথচ কোনও রেলিং নেই। কয়েকশ ফিট নিচে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বয়ে চলেছে ভয়াল তিস্তা।**

ছোট ছোট রঙিন ঘরবাড়িগুলি দেখে বুঝতে পারলাম গন্তব্যস্থলের খুব কাছে আমরা। অবশেষে লাচেন যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটায় বিকেল সাড়ে চারটা।

সমুদ্র সমতল থেকে ৯,০০০ ফিট উচ্চতায় লাচেন, পুলিশ চেকপোষ্টে কাগজপত্র দেখিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম। তারপর ওয়াই ওয়াই সহযোগে আবার এককাপ চা। এবার আমাদের সিদ্ধান্তের আমূল পরিবর্তন। ঝুঁকিবহুল সিদ্ধান্ত ছিল বটে। কিন্তু ভয় কীসের? আর দশজন পর্যটকের মত যদি আমরাও লাচেনে রাত কাটাই তবে পার্থক্য রইল কোথায়?

তাপমাত্রা ৪ থেকে ৩ ডিগ্রি হবে। এই অসময়ে, এই অজানা পথে শুধুমাত্র স্থানীয় কিছু মানুষের কথা শুনে আমরা আবার এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। রোমাঞ্চ তো ছিলই তবে যে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় আমরা এই মুহূর্তে অজানা পথে শুরু করলাম তার পরিণতি কী কী হতে পারে সেটা ভেবে পরিবারের প্রিয়জনের মুখগুলি বারে বারে ভেসে উঠছিল চোখের সামনে।

লাচেন থেকে সোজা উত্তরের যে রাস্তা ধরে আমরা এখন চলেছি তার সর্বশেষ জনপদটি রয়েছে এখান থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে। মাত্র ৩৫ কিলোমিটারের এই পথ আমাদের নিয়ে যাবে আরও ৪,০০০ ফিট উপরে। সমুদ্র সমতল থেকে ১৩,০০০

ফুট উচ্চতায় অবস্থিত 'থাঙ্গু ভ্যালিতে' পৌঁছে মাথা গোঁজবার কোনও জায়গা মিলবে কি না সেটা নিয়ে একবারও মাথা ঘামাই নি। তবে ভাবাতে শুরু করল সামনের হেয়ারপিন টার্ন সমৃদ্ধ কঠিন খাড়াই পথহীন পথ, উচ্চতার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলা ঠান্ডা, অক্সিজেনের ঘাটতি আর আমাদের হাতে থাকা অনেক কম সময়। লাচেন থেকে থাঙ্গু ভ্যালি। এই পথের আশপাশে সভ্যতার কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আধুনিক সভ্যতার সাথে সমস্ত রকম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। তবে সম্পর্কটা এখন শুধু প্রকৃতির সাথে। ভয়াল এই প্রকৃতিও তার গুরুগম্ভীর ভালবাসা দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাদের। এসব উপভোগ করতে করতে এপাহাড় থেকে ওপাহাড় বেয়ে উপরে উঠে চলেছি সর্পিল গতিতে। যত উপরে উঠছিলাম পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা ঝোপঝাড়গুলি ছোট হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রকৃতির ভয়ঙ্করতা যেন আরও বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। পাথুরে পাহাড়ের এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে এখন আমরা শুধুই দু'জন।

এবার কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসতে

শুরু করল। সূর্য সত্যি সত্যি লুকিয়ে পড়ল পাহাড়ের মাঝে। হেডলাইট জ্বলেছিল আগেই। এবার ফগলাইট জ্বালাতে হল। কোনওরকম বিরতি না দিয়েই মাত্র ২৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে এসেছি। রাস্তা এখন বড় পিচ্ছিল। বরফের কঠিন আস্তরণ তার গায়ে মাখানো। চারিদিক ঘন অন্ধকার। বাতাসের তাপমাত্রা নেমে গেছে ১ ডিগ্রিতে। অক্সিজেনের ঘাটতি অনুভূত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শরীরে তীরের মত প্রবেশ করছে হিমশীতল বাতাস। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে শুধুমাত্র মনের জোরে দুর্গমকে জয় করার নেশায় আমরা উঠে যাচ্ছি আরও উপরে। প্রবল জোরে বাতাস বইছিল

**যুদ্ধটা এবার শুরু হয়ে গেছে সেয়ানে সেয়ানে। অদৃশ্য শৈত্য দানবেরা ভেঙে চলেছে একের পর এক ব্যারিকেড। সুতীব্র গতিতে আঘাত হানছে শরীরের মাংসের আস্তরণে। সংকুচিত হচ্ছিল মাংসপেশী। হাত-পা অবশ করে দিয়ে যেন ওরা বলতে চাইছে- 'বাচ্চেলোগ ভাগ যাও হিঁয়াসে'। মাইনাস দুই ডিগ্রি নয়। এখন আমরা মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি তাপমাত্রার ঘেরাটোপে।**

সারা পাহাড় জুড়ে। হাত পা অসাড় হয়ে আসছিল। বাধ্য হলাম বাইক থামাতে। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়াটা যে আরও কঠিন তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম বাইক থামিয়ে। কোনওমতে এমারজেন্সি লাইট জ্বেলে ডাবল হ্যান্ডগ্লাভস পরে নিলাম। আর মাত্র ৫ কিলোমিটার। কিন্তু এবার শুরু হল নতুন চ্যালেঞ্জ। রাস্তাজুড়ে জমে রয়েছে কঠিন বরফ। ভীষণ ভীষণ পিচ্ছিল। অগত্যা এই হাড়হিম করা ঠান্ডায় বাইক থেকে নামতে হল দু'জনকেই। বাইক ঠেলে ঠেলে অতি সাবধানে এগোতে লাগলাম রাস্তার এক্কেবারে ডানদিক ঘেঁষে; কারণ বাঁদিকে সুগভীর খাদ। হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিলাম অক্সিজেনের ঘাটতিটুকুও। এভাবেই প্রতিকুলতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে পাঁচ কিলোমিটার পেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায় থাঙ্গু ভ্যালি? কিছুটা দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু নজরে এলো। প্রচণ্ড ঠান্ডা চারিদিকে। প্রবল শৈত্য প্রবাহ চলছে। জুবুথুবু অবস্থা আমাদের। বুঝলাম উপত্যকার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইক রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে চারপাশ খোলা একটি শেডের নীচে দাঁড়িয়ে তখন আমরা রীতিমত কাঁপছি আর জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি।

হঠাৎ করে নজরে এল দূরে একজন মহিলা, ঘর থেকে বেরিয়েছেন তিনি সবে। দৌঁড়ে পৌঁছলাম তার কাছে। ওনাকে আর বেশি কিছু বলতে হল না। সাদরে ঘরে ডাকলেন। আমরাও প্রবেশ করলাম তার কুটীরে। ভেতরে বুখারি জ্বলছিল। বুখারির তপ্ত আগুনে নিজেদেরকে সেঁকে নিলাম কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে গঙ্গা বইনি শুনে নিয়েছেন আমাদের বিস্তারিত সবকিছু। পাশেই ওনার আর একটি ঘর রয়েছে। গঙ্গা বইনি ওখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাইরে হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে। তাপমাত্রা ইতিমধ্যে শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে গেছে। গঙ্গা বইনি দু'বাটি গুন্দ্রুকের স্যুপ দিলেন আমাদের। বললেন— 'শরীর গরম হবে; খেয়ে নাও'। আমরাও পরম তৃপ্তিতে পান করলাম গুন্দ্রুকের স্যুপ। শ্বাসগুলি এখন বড় বড় পড়লেও অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলাম। গঙ্গা বইনিও সেই বুখারির আগুন ব্যবহার করেই আমাদের রাতের খাবারের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করে ফেললেন পর্ক ও প্লেন রাইস। চোখের সামনে দেখলাম পর্ক রাঁধবার খুব সহজ পদ্ধতি। ভীষণ তৃপ্তি সহকারে ডিনার শেষ করলাম। দরজা খুলে একটু উঁকি মারলাম বাইরে। দেখলাম শ্বেতশুভ্র চাদর মুড়ি দিয়ে থাঙ্গু উপত্যকা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমরাও এবার ঘুমাতে গেলাম নির্দিষ্ট ঘরে। ভাবছিলাম গঙ্গা বইনির কথা। তার এই আতিথেয়তার কথা। দুর্গম এই পাহাড়ি উপত্যকায় কোন সাহসে, কোন বিশ্বাসে তিনি অপরিচিত এই দুই যুবককে রাত কাটাবার জায়গা করে দিলেন নিজের ঘরে তা মাথায় ঢুকছিল না কিছুতেই। শরীরে ক্লান্তি ছিল ভীষণ। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছিলাম তা ঠিক জানা নেই।

সকালে ১৪,০০০ ফিট থেকে যাত্রা শুরু করেছি আমরা। সামনে আর মাত্র ৩৫ কিলোমিটার পথ। কিলোমিটারে খুব কম মনে হলেও উচ্চতায় কিন্তু অনেক বেশি। মাত্র ৩৫ কিলোমিটারের এই পথ ধরেই আমরা পৌঁছে যাব সমুদ্র সমতল থেকে ১৭,৮০০ ফিট উচ্চতায়। আর সেখানেই দেখা হবে হিমালয়ের কোলে সযত্নে লালিতা স্নিগ্ধ শীতল পাহাড়ি অপ্সরা গুরুদংমার লেক-এর সাথে। ল্যাপটপ বা স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে যার ছবি দেখে স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতাম একটু পরেই পৌঁছাব তার শ্বেতশুভ্র নীলাভ সবুজ সাম্রাজ্যে। এসব ভাবতে ভাবতেই অনেকটা এগিয়ে এসেছি। উচ্চতার সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমাগত কমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। কিলোমিটার সাতেক এগোতেই শূন্য থেকে মাইনাস দুই। সবুজের কোনও ছিটেফোঁটা নেই আশেপাশে। কিছুদূর পরপরই দেখা মিলছে পাহাড়ের ঢালে ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মিলিটারি বেসের। ওপরে দিগন্ত বিস্তৃত প্রুশিয়ান ব্লু। নীচে রঙ বেরঙের ন্যাড়া পাহাড়। আর তার মাঝে এই আঁকাবাঁকা ধূসর পথ।

আবহাওয়া আজ আমাদের সাথে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফের সারি সূর্যের আলোয় চকচক করছিল। তাপমাত্রাও সেই মাইনাস দুই ডিগ্রিতেই রয়েছে। তবে বাতাস যে অনেকটাই পাতলা হয়ে গেছে তা অনুভব করছিলাম। বুঝে গিয়েছিলাম লেকের আবহাওয়া অনুকূল রয়েছে। যথাস্থানে কাগজপত্র দেখালাম। সুদীর্ঘ এই পথের শেষ চেকপোস্টের সবুজ সঙ্কেতটুকু হাতে পেয়ে চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করে উঠল। আসলে বহু আশা, স্বপ্ন, আত্মবিশ্বাস, সর্বোপরি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অসময়ে এতদূর পৌঁছে, শুধুমাত্র প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এখান থেকে ফিরে যেতে হলে মানসিকভাবে সত্যি কিছুটা ভেঙ্গে পড়তাম বৈকি।

যুদ্ধটা এবার শুরু হয়ে গেছে সেয়ানে সেয়ানে। অদৃশ্য শৈত্য দানবেরা ভেঙে চলেছে একের পর এক ব্যারিকেড। সুতীব্র গতিতে আঘাত হানছে শরীরের মাংসের আস্তরণে। সংকুচিত হচ্ছিল মাংসপেশী। হাত-পা অবশ করে দিয়ে যেন ওরা বলতে চাইছে— 'বাচ্চেলোগ ভাগ যাও হিঁয়াসে'। মাইনাস দুই ডিগ্রি নয়। এখন আমরা মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি তাপমাত্রার ঘেরাটোপে। হেভি উলেন, ডাবল হ্যান্ড গ্লোভ, ডাবল সক্স, বাফ, মাঙ্কিক্যাপ ইতিমধ্যেই বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে দানবের স্পর্ধার কাছে। তবে এই দু'জোড়া চোখ আর একজোড়া হৃদয় যে সহজে মাথা নত করতে জানে না তা বোধকরি মাথার উপর এই দিগন্ত বিস্তৃত ঘন প্রুশিয়ান-ব্লু বা কোবাল্ট ব্লু-ই জানে। হিমশীতল এই মরুভূমির বুকের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রঙ বেরঙের ছোট বড় পাহাড়। গায়ে দুধ-সাদা রঙের বরফের আলপনা। সেজেগুজে তারা একেবারে পরিপাটি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আমাদেরকেও ঘিরে রেখেছে পরম ভালবাসায়। আর তাদের মাঝেই নিঃশব্দে শুয়ে রয়েছে নিকস কালো হিল পাইথন। যার পিঠের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি আমরা। গাইগাও চেকপোষ্ট থেকে কিলোমিটার ছ'য়েক পার করে বাইক থামালাম। গঙ্গা বইনির দেওয়া গরম জল কিছুটা পান করবার পর পপকর্নের সাথে মিনিট দশেক সময় কাটালাম এই ভুস্বর্গে। পথে আর দেরি করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ সকাল এগারোটার পর থেকেই এই এলাকার আবহাওয়া ভীষণ খারাপ হতে শুরু করে।

এগিয়ে চলেছি স্বপ্নপুরণ করবার আনন্দে। জনমানবহীন আমাদের চারপাশ। ক্রিষ্টাল ক্লিয়ার ওয়েদার। বিশ্বাসই হল না যে এক নিমেষে এই আবহাওয়া খারাপ হতে পারে। চলতে চলতে সামনেই নজরে এল দিক নির্দেশক চিহ্ন। উপরে লেখা গুরুদংমার লেক। ব্যাস চোখগুলি আমাদের চকচক করে উঠল। ব্ল্যাক পাইথনের পিঠ থেকে নেমে বাইকের ডান দিকে টার্ন। পথহীন পথে একটু এগোতেই স্বপ্ন আমাদের একেবারে হাতের মুঠোয়। বিশ্বাস হচ্ছে না তবুও বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মরশুমের শেষ ট্রাভেলার হিসাবে আমরা পৌঁছে গিয়েছি পৃথিবীর উচ্চতম লেকগুলির মধ্যে অন্যতম ইন্দোচীন সীমান্তের গুরুদংমার লেকে। ১৭,৮০০ ফিট উচ্চতায় মাইনাস ছয় ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই স্বর্গলোকে দাঁড়িয়ে হৃদয় থেকে সেই মুহূর্তে এই শব্দবন্ধটুকুই বেরিয়ে আসছিল, 'ওহ মাই গড ! ওহ মাই গড ! ইটস অসাম অসাম অ্যান্ড অসাম'।

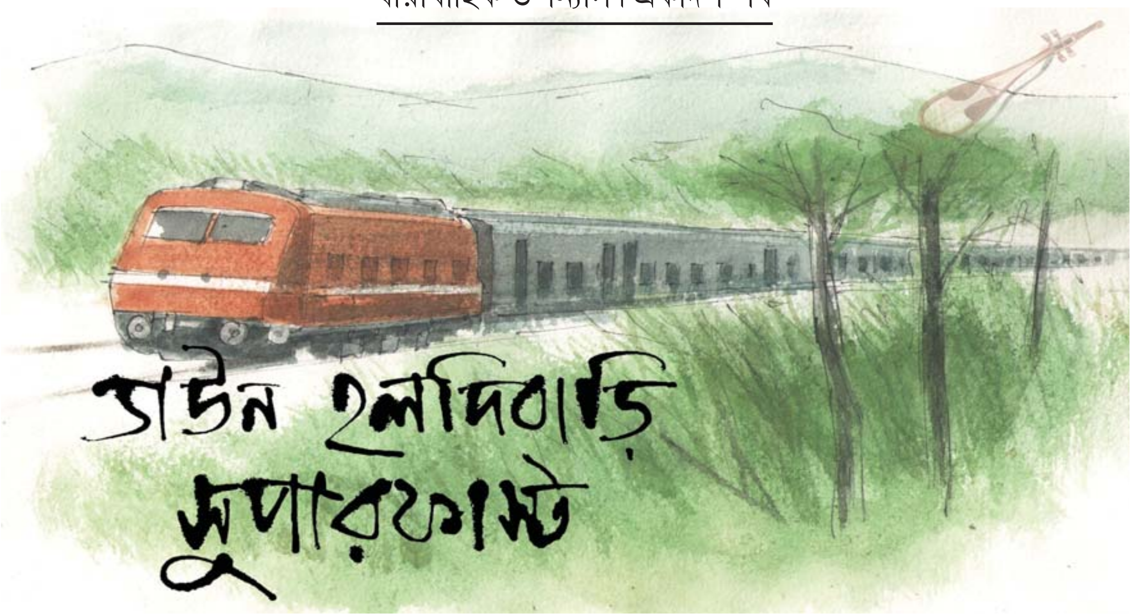


সুজিত দাস

**মাটির মঞ্চটা অসাধারণ। পুরনো বাড়ির সামনে আড্ডা দেওয়ার রকের মত করে বানানো। মাটি থেকে সামান্য উঁচু। স্টেজ নাও বলা যায় আবার বললেও অত্যুক্তি হবে না। ব্যাকড্রপে একটি মাটির দেওয়াল। ইলা ব্যানার্জি এসেছেন এই আয়োজনে। সঙ্গে আরাত্রিকা। দূরে দাঁড়িয়ে দুজন সাদা পোষাকের অফিসার বেশ বিস্মিত, কেসটা দেখেছেন বড়বাবু, সব কেমন অগোছালো। অথচ কী অদ্ভুত সিনক্রোনাইজেশন! 'দেখেছি স্যর, ভেতরে একটা বড় খেলা আছে। মনে হচ্ছে।' সত্যিই এক অদ্ভুত খেলা। প্যাসেঞ্জারদের দুটি দল। কবিতা বনাম ক্রাইম? পড়তে থাকুন।**

২১

মাঝে মধ্যে মনের ভেতরে একটা হাড়জ্বালানো পাখি এসে বসে। পাখিটার গায়ে অনেক রঙিন পালক, ভোরের আলো। গলায় খুব মিষ্টি আওয়াজ। সবকিছু এত ভাল তবু পাখিটা যখন মাথার ভেতরে আসে, এইচ ডি-র মনটা খাঁ খাঁ করে। লালপুল শ্মশানের ঘুঘুডাকা বিষণ্ণ দুপুরের মত। জমি, পাখি, মেয়েছেলে আর খবর নিয়ে হরিদাস সাহার একটা অগোছালো জীবন। এই একটামাত্র জীবনে, সহস্র ভুলের মধ্যেও মাটিই হল এইচ ডি-র একমাত্র কাছের জিনিষ। জমি আর মাটির কতরকমের যে চরিত্র বাপ! ভোরের জমিনের একটা স্নিগ্ধ রূপ আছে। বিকেলের দিকে

ভেজা মাটির আলাদা গন্ধ। আর দুপুরের মাটি রাতজাগা নারীর মত। কখন কী ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না। এই মাটির নেশায় সারাটা জীবন খপত হয়ে গেল। তবু হরিদাস একটা বিরাট ভূখণ্ড নিজের দখলে রাখতে চায়। আসলে তো নিজের জন্য নয়, জিনকে জমিনের মত রাখতে চায় ও। সেখানে ধানের চাষ হবে, বীজ থেকে মাথা তুলবে গাছ। তবেই না মজা। জমির ওপর কংক্রিটের জঙ্গল আর ইলেকট্রিকের হাইটেনশন দেখলে মাথাটা কেমন পেগলে যায় এইচ ডি-র। এইভাবেই ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে, মফস্বল থেকে। যত পেছোচ্ছে ততই জমিনের মাপ বাড়ছে। কিছুদিন বাদে বাদেই পুরনো জমিনের দাম এত বেড়ে যাচ্ছে, লোভ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওকে। বেচে দিয়ে একই টাকায় আরও বড় জমিনের খোঁজ পেয়ে যায় হরি। এইচ ডি সাহা, লোকাল করেসপন্ডেন্ট, দ্য ডেইলি নিউ এজ। সম্পাদক, জলঢাকা নিউজ। কিন্তু পেছতে পেছতে আর কত পেছবে হরি! এরপরে কোনও একদিন হয়ত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে। পৃথিবীর দেওয়ালটা ঠিক কোথায়? কোনখানে গেলে আর কোনও জমিন থাকবে না? এর শেষ দেখতে চায় হরি।

এই মুহূর্তে গোমটু বর্ডারের পাশে নাংডালা চা-বাগানের ভেতরবাগে সবুজ ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে হরি। পাশে শুক্রা ওঁরাও। সেই রাতে অ্যাকশনের পর থেকেই শুক্রাকে নাংডালা বাগানের পাশে একটা কাঠের বাড়িতে রেখেছে হরি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি কিন্তু সঙ্গে নয় বিঘা পাথুরে জমি। জমিটাই সাতভাতারি। প্রতি বর্ষায় নদীর গতিপথ বদলায়। হয় জমি কমে যায় কয়েক ছটাক নয়ত বাড়ে। শালা নদীর এই খামখেয়ালিপনা দেখে খুব ভাল লাগে হরিদাস সাহার। এই জমিতে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করেছে হরি। এই তল্লাটের কিছু মেয়ে, যারা আড়কাঠির হাতে পাচার হয়ে গিয়েছিল মুম্বাইয়ের ড্যান্স বারে কিংবা শিলিগুড়ির হোটেলগুলোতে, তাদের অনেককেই কাজ দিয়েছে হরি। মাটি বানাও, স্ট্রবেরি লাগাও, দেখভাল কর তারপর বাজারে পাঠাও। বলতে নেই প্রায় তিরিশ জন মেয়ে টিকে গেছে এইখানে। এই জমির মালিক হরিদাস কিন্তু মাটির ফসল মেয়েদের। এ বড় আজব সুখ। তবে ফিরিয়ে আনা সব মেয়েই যে থেকে যায় তা কিন্তু নয়। রঙিন জীবনের নেশা একবার চোখে লেগে গেলে অনেকেই আবার ফিরে যায় ওই জীবনে। সহজ পয়াসার টান খুব, নিশি ডাকের মত। তবু যারা টিকে যায় তারা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে। আরও স্ট্রবেরি, আরও একটু ভালভাবে বাঁচা।

জমি পাহারা দেওয়ার জন্য আরেকজন লোক দরকার, অনেকদিন ধরেই মেয়েরা বলছিল এইচ ডিকে। এই সুযোগে শুক্রাকে নিয়ে আসে হরি। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় মানুষজনই বেশি নেই তো পুলিশ! কাঠের বাড়ির একটা ঘরে বেশ ভালই আছে শুক্রা। তবে মোবাইল নেই বলে খুব মন খারাপ ছিল। আজ একটা নতুন সিম আর মোবাইল নিয়ে এসেছে এইচ ডি। তবে ফেসবুক করতে বারণ করেছে। আর

**একটু দূরে একটা বড় কুর্শা মাছ দেখেছে হরি। আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। টোপের ধারে কাছে নেই। হরিও দেখে যাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে। ঠিক মাল টাউনবাবুর বউটার মতই। বড়, ডবকা চেহারা। তবে খলরবলর খুব বেশি। এই কুর্শা মাছটার মতই। টোপ গিলবে তবে অনেকটা খেলিয়ে, ক্লান্ত করে দিয়ে। না গিলে উপায় নেই মাছটার। এক অদম্য খিদে ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পড়ন্ত আলোয় ধৈর্য ধরে বসে হরি। জলের মাছ আর ডাঙার মেয়েছেলে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও লাভ নেই।**

তো কয়েকটা মাত্র দিন। পার্টি এখন হরেন কুন্ডুকে চেনে না। সবাই হাত ধুয়ে ফেলেছে। লাল পার্টির এই গুণটা আছে। নীল পার্টি চোর ছ্যাঁচোড়দের বিপদে আপদে শেলটার দেয় কিন্তু লাল পার্টির ওপরটা মন্দিরের গর্ভগৃহের মতই পবিত্র যেন। ওখানে কোনও চুদুরবুদুর নেই। একবার গায়ে গন্ধ লেগে পার্টি তোমার সঙ্গে নেই। গন্ধ তো পার্টির গোটা শরীরেই। কিন্তু নাকে এলে তুমি বাদ। পার্টির গঠনতন্ত্র মেনে তোমাকে বহিষ্কার করা হবে। গণশক্তেতে জানিয়েও দেওয়া হবে সেই খবর। তাই হরেন কুন্ডু এখন নো বডি। সেই থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড। তবে হরেন তো টাকাও কম বিলোয় নি। শোনা যায় কলকাতার এক নেতা হরেনের আগাম জামিনের আবেদন করিয়েছিল হাইকোর্টে। সেটা খারিজ হয়ে গেছে। হরেনের লোকজন ছিটকে গেছে এদিক ওদিক। কয়েকজনের নাম এফআইআরে ছিল। তারা প্রায় সকলেই ধরা পড়েছে। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির দুজন মেম্বার এখন মধুপুর জেলে। আশ্চর্যজনক ভাবে শুক্রার নাম এফআইআরে নেই। অথচ থাকার কথা কারণ শুক্রা হরেনের খুব কাছের একজন হেঞ্চম্যান। তবু শুক্রার নাম ও নিশান কোথাও নেই। এই ব্যাপারটাই ভাবাচ্ছে এইচ ডি-কে। বাটা সুভাষ আগেই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল,

'শুক্রাকে কয়েকদিন বাইরে রাখ হরি। সব ঠিক হয়ে যাবে। এই কয়েকটা দিন যাতে ও ধরা না পড়ে।'

সবকিছুই কি তবে আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল? নিজের মনের মধ্যেই হাতড়াতে থাকে এইচ ডি। এস ডি পি ও দাত্তা সাহেব কঠিন মানুষ। ফুলপ্রুফ কেস বানিয়েছেন। তাহলে শুক্রা বাদ কেন? তবে কি দাত্তা সাহেবও?

'দাদা, মোবাইলটা তো ঘ্যাম দিসিস রে।'

শুক্রা চিলি চিকেনের শেষ পিসটা মুখে দিয়ে হরির দিকে তাকিয়ে হাসে। খেতে ভালোবাসে ছেলেটা। এই ক'দিন নাংডালা চা-বাগানে শুধু আলু আর টমেটোর লাল ঝোল আর মাঝে মধ্যে ডিম খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ও। হরি বীরপাড়া থেকেই দু-প্লেট চিলি চিকেন নিয়ে এসেছে। ক্যাপসিকাম, ডল্লে খুরসানি দিয়ে বানানো জবর চিলি চিকেন। ব্রহ্মতালু অবধি গরম হয়ে যাবে এই চিলি চিকেনে।

'আর তো কয়েকটা দিন, এরপর তুই সোজা শিলিগুড়ি চলে যাবি। সুমন লামা-র প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে সুপারভাইজারের কাজ তোর জন্য দেখে রেখেছে সুভাষ দা। ভালোই মাইনে দেবে, একটু কমপিউটারের কাজ শিখে নিস আস্তে আস্তে।'

'ঠিক আসে দাদা, একখান মোবাইল হাতে থাকিলে কুনো চিন্তা নাই। সময় কাটি যায় ফুড়ুত ফুড়ুত', চিলি চিকেন আর নতুন মোবাইল অনেকটা শান্ত করেছে শুক্রাকে।

স্ট্রবেরি খেতটা একবার চক্কর দেয় হরি। মাটির একটু ওপরে ফলগুলো শুয়ে আছে। কোনওটা সবুজ, কোনওটা লাল। মেয়েরা কাজে ব্যস্ত। আজ প্রায় দশ কেজি মাল হাসিমারা বাজারে গেছে। ওখানকার আর্মি ক্যান্টনমেন্টে এই স্ট্রবেরির খুব ডিমান্ড। আস্তে আস্তে নদীর পারে গিয়ে বসে এইচ ডি। হাতে কঞ্চির ছোট্ট একটা ছিপ। নদীতে এখন বড়জোর তিনহাত জল। নীচের শ্যাওলা পড়া রঙিন পাথর দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। দেখা যাচ্ছে রূপো রং নদীয়ালি মাছের ঝাঁক। কেঁচোর টোপ বঁড়শিতে গেঁথে ছিপ ফেলে হরি। একটার পর একটা মাছ উঠে আসছে টপাটপ। ছোটবেলা থেকেই ওর মাছ ধরার হাত খুব ভাল। নদীয়ালি মাছ ধরার আলাদা টেকনিক আছে। সেটা হরি রপ্ত করেছে একেবারে নিখুঁত। মেয়েছেলে আর মাছ কখন টোপ গিলবে, এই গুহ্য কথা জানে হরি। কতটা খেলাবে, কতটা খেলবে, মুখস্ত। একটু দূরে একটা বড় কুর্শা মাছ দেখেছে হরি। আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। টোপের ধারে কাছে নেই। হরিও দেখে যাচ্ছে মনযোগ দিয়ে। ঠিক মাল টাউনবাবুর বউটার মতই। বড়, ডবকা চেহারা। তবে খলরবলর খুব বেশি। এই কুর্শা মাছটার মতই। টোপ গিলবে তবে অনেকটা খেলিয়ে, ক্লান্ত করে দিয়ে। না গিলে উপায় নেই মাছটার। এক অদম্য খিদে ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পড়ন্ত আলোয় ধৈর্য ধরে বসে হরি। জলের মাছ আর ডাঙার মেয়েছেলে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও লাভ নেই। এই কঞ্চির ছিপে ফাতনা নেই। স্রেফ টান অনুভব করেই তুলে ফেলতে হবে। ফাতনা অনেক সময় ভুল সংকেত দেয়। আলো বেশ কমে এসেছে। কিন্তু হরি জানে ওই কুর্শা মাছটি কোথাও যাবে না। এক অদম্য খিদে ওকে

গ্রাস করে রেখেছে। টাউনবাবুর ডবকা বউটার মত।

গাঢ় হতে থাকা অন্ধকারে ওত পেতে বসে থাকে হরি।

মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরতে থাকে, শুক্রার নাম এফ আই আরে নেই কেন? দাত্তাসাহেব এত কাঁচা করার মানুষ না। তবে কি...

ছিপে একটা জোর টান অনুভব করে এইচ ডি। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ডাঙায় তুলে তুলে ফেলে রূপোলী মাছটিকে। খেলা শেষ। ধৈর্যের আর একটা ছোট পরীক্ষায় আবার জিততে পেরে মনটা হালকা লাগে, পালকের মত হালকা।

মহদিপুরের পি এইচ ই বাংলো এখনও একটা অনিবার্য মাইল ফলক সৌরভের জীবনে। যেখানে রাত্রি একটু গভীর হলে তার মা উঠে যেত দোতলার ঘরে। বাবা ইংলিশবাজার ভাটির গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে থাকত নীচে। সেইখান থেকে ব্যানার্জি উকিলের দৌলতে আজ সৌরভ একজন আই পি এস। কিন্তু কোথাও গিয়ে একজন অ্যানার্কিস্টও বটে। এই যে একটা আপাত শান্ত পৃথিবী তার ভেতরেও কত চোরা স্রোত, কত বঞ্চনা। রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে থেকেও ভেতরে ভেতরে একটা আগুন ছাইচাপা ছিল এতদিন। হঠাৎ সেই ঘুমিয়ে থাকা আগুনটা জ্বলে উঠতে চাইছে দাউদাউ। এই তো ছোট্ট একটা বিন্দুর মত জীবন, এই আছে এই নেই। বাঁচতে হলে নিজের টার্মসে বাঁচতে হবে। তবে যতদিন সিস্টেমের মধ্যে থেকে লড়া যায়, ততদিনই কাজটা আর ভালমত করা সম্ভব। অফিসের সামনে রুদ্রপলাশ গাছটির সবুজ মোহিত করে সৌরভকে। আজ রাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খাকি উর্দির আড়ালে অন্য আরেকটি মানুষকে লুকিয়ে রাখার দিন সমাগত।

মিলন গোম্বু সময়ের থেকে খানিকটা এগিয়ে রাখেন নিজের ঘড়ির কাঁটা।

গজলডোবার পাশে একটা ছোট্ট হোমস্টেতে সবার আগেই পৌঁছে গেছেন উনি। এই হোমস্টের মালিক ধীরেন বসুনিয়া মিলনজীর নিজের লোক। ধীরেন বসুনিয়া নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। বউ মিনতিই এই হোমস্টে দেখাশোনা করে। আর ধীরেন সকাল থেকে নিজের ডিঙি নৌকা নিয়ে গজলডোবায় ফটোগ্রাফারদের পাখির ছবি তুলতে নিয়ে যায়। এই সূত্রে অনেক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ। আজকাল পুলিশেরাও ছবি তোলে, গান গায়, ছবি আঁকে। মোটমাট, ধীরেন বসুনিয়া একজন ছাপোষা মানুষ। সাতেপাঁচে না থাকা মানুষ। ছেলেপুলে নেই। ঘরের কথা ঘরেই থাকে। মিলনজীর মতে বসুনিয়ার বাড়ির থেকে ভাল 'সেফ হাউস' পাওয়া অসম্ভব। আজ বিকেল থেকেই পাঁচ জন ছবি তুলিয়েকে নিয়ে জলের ওপর ধীরেনের ডিঙি নৌকা ঘুরছে। দুজন মহিলা, তিন জন পুরুষ। দুজন মহিলার হাতেই বড় লেন্সের ক্যামেরা। ছবি তোলা শেষ করে এই পাঁচজন ফিরে আসে ধীরেন-মিনতির ছোট্ট হোমস্টেতে। এতক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। মিলন গোম্বু এখানেই অপেক্ষা করছেন।

হোমস্টের ভেতরের দিকে একটা ছোট লন। তিনদিন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের ওপর থেকে ব্লিডিং হার্ট ফুলের গাছ বিছিয়ে রাখা। মৃদু আলোয়

> **হোমস্টের ভেতরের দিকে একটা ছোট লন। তিনদিন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের ওপর থেকে ব্লিডিং হার্ট ফুলের গাছ বিছিয়ে রাখা। মৃদু আলোয় লালসাদা এই ফুলগুলো জ্বলজ্বল করছে। মিলন গোম্বু এতক্ষণে নিজের গাড়ি থেকে চারটে লং রেঞ্জ, ডজনখানেক নাইন এম এম আর বেশ কিছু সি ফোর এক্সপ্লোসিভ যেখানে রাখার রেখে দিয়েছেন। বাড়ির মালকিন ভালই জানে কোথায় কী লুকোতে হয়।**

লালসাদা এই ফুলগুলো জ্বলজ্বল করছে। মিলন গোম্বু এতক্ষণে নিজের গাড়ি থেকে চারটে লং রেঞ্জ, ডজনখানেক নাইন এম এম আর বেশ কিছু সি ফোর এক্সপ্লোসিভ যেখানে রাখার রেখে দিয়েছেন। বাড়ির মালকিন ভালই জানে কোথায় কী লুকোতে হয়। পাঁচজনের জন্য চায়ের পট নিয়ে আসে ছোটখাট চেহারার মিনতি। আজ এইখানে অন্য কোনও গেস্ট-এর বুকিং নেই।

চা দিতে গিয়ে দুজন মহিলাকে ভাল করে লক্ষ্য করে মিনতি। একজন কী লম্বা রে বাপ, ব্যাটাছেলেদের মত, খুব শক্তপোক্ত। পরনে জিনের প্যান্ট আর অর্ধেক বুকখোলা কালো শার্ট। অন্যজন ভারি মিষ্টি দেখতে। ঘোড়ার লেজের মত চুল। রোগাপাতলা চেহারা তবে অত ভারি ফটো তোলার যন্ত্রপাতি অবলীলায় বয়ে নিয়ে এসেছে পিঠের ব্যাগে।

'সো মিলনজী, আপনি যা অর্ডার করেছিলেন সবটাই জোগাড় হয়ে গেছে', সুভাষই প্রথম মুখ খোলে।

'এই হোমস্টে ঠিক কতটা সেফ?', সৌরভ জিজ্ঞেস করে। ওকে আজ লাল টি-শার্ট আর ফেডেড নীল রঙের জিন্সে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে।

'অ্যাজ সেফ অ্যাজ উই ক্যান থিঙ্ক স্যর', তবে দু'একদিনের মধ্যেই অর্ধেক 'বাচ্চা' মংরা নিয়ে চলে যাবে আপার চ্যাংমারি', বলেই মংরার দিকে তাকান মিলনজী।

'বাট হু উইল অপারেট দ্য থিঙ্গস কারণ আমাদের কাজ শুধু ভয় দেখানো এবং তাও বিনা রক্তপাতে। তাই সেইভাবে ট্রেইন্ড লোক চাই', খুব সতর্ক শোনায় সৌরভের আওয়াজ।

'অবশ্যই', এতক্ষণ চুপ করেই শুনছিলেন রাধারানি। এই প্রথমবারের জন্য কথা বললেন, 'যারা অপারেট করবে তাদেরকে এতদিন ধরে গ্রুম করেছে সোহিনী। লোকাল লোককে ইনভলভ না করে আমরা ভেবেছি আসাম থেকেই এই ব্যাপারে প্রোফেশনাল লোককে নিয়ে আসলে ভাল হয়। এরপর থেকে এদের আমরা ফুটবলার বলব।'

'দ্যাটস গুড'।

'আমার কাছে যা খবর গোটা এলাকায় হরেন কুণ্ডুর লোকজন আন্ডারগ্রাউন্ডে। পার্টির নেতারা পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। দিস ইজ হাই টাইম হরেনের লোকদেখানো হোমস্টে আর থালঝোরা-নাগরাকাটায় ভুটান মদের গোডাউনগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার', রাধারানির স্টেটমেন্টগুলোও কখনও কখনও নির্দেশের মত শোনায়, 'তাছাড়া পুলিশের টেলিফোনে আড়ি পেতে যতটুকু শুনেছি আমি তাতে কোড গ্রিন এবং আমাদের টুকটাক অপারেশনগুলো নিয়ে দে হ্যাভ নো আইডিয়া। নো আইডিয়া মানে নো আইডিয়া। ওরা ভাবছে গ্রুপ রাইভালরি।'

'ফুটবলারদের জন্য টাকাপয়সা?', সৌরভের আজ জিজ্ঞেস করার দিন।

'ওদের আমি কিছুটা পে করেছি, অ্যাজ অ্যাডভান্স। কোড গ্রিন'-এর নিজস্ব ফান্ড থেকে। বাকিটা ট্রিপল আর জানেন', সোহিনীর জবাব।

'মংরা, উইলের চেকটা আমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। তিরিশ লাখ। আর তারক ব্যানার্জির তিন। তেত্রিশ লাখ আমার কাছেই আছে। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে আমাদের টাকা ছড়িয়ে আছে। টাকাটা কোনও ইস্যু নয়।'

'টার্গেট ঠিক করে ফেলাটা খুব জরুরি', মংরা সরাসরি কাজের কথায় আসে।

'ওটা এইচ ডি-র ওপর ছেড়ে রাখা আছে। একটা গেস্ট হাউসও আছে মূর্তি নদীর আশেপাশে। পুরোটাই মধুচক্র। ওটাকেও টার্গেটে ইনক্লুড করে নিতে হবে', মিলনজী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'আর সোহিনী ম্যাডাম, দাত্তাসাহেব আপনাকে জানিয়ে দেবেন আসাম থেকে কবে এবং কীভাবে আমাদের 'ফুটবলার'রা আসবে। আমাকে আজ উঠতে হবে। স্যর জানেন, অফিসে কাজ আছে।'

'মিলনজী, আরেকটা টার্গেট এন জে পি এলাকায়। এন জে পি-র সিন্ডিকেট পয়সা তোলে না এমন কোনও এরিয়া নেই। ট্রেনের রেক লোডিং-আনলোডিং থেকে ইন্ডিয়ান অয়েলের ট্যাঙ্কার সব। জানেন আপনি। এমনকী, স্ট্যান্ডে ভাড়া খাটে যে গাড়িগুলো সেগুলো থেকে। হকারদের থেকেও।'

'চিকা?'

'চিকা বিশু লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসবে মিলনজী।

পলিটিক্স জয়েন করবে। বেশিদূর এগোতে পারবে না। কারণ চিকা হার্ডকোর ক্রিমিনাল। পলিটিক্স অনেক ফাইন টিউন ডিমান্ড করে।'

বাটা সুভাষের শেষ কথায় সকলেই হেসে ওঠে। মিলনজী সবাইকে গুডনাইট জানিয়ে ফিরে যায় শিলিগুড়ি।

গজলডোবা ব্যারাজের থেকে জল ছাড়ার আওয়াজ রাতের নৈঃশব্দের ওপর একটা অনর্থক যতিচিহ্ন যেন। অনেকদিন বাদে সোহিনী রাঠোর আর সৌরভ দত্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া দূরত্বে। সার্কিট হাউসের সেই বিকেলের এতদিন পরে আজ আবার।

'ইউ টু, সোহিনী?'

'ইয়েস মি টু, দাত্তাসাহেব', সৌরভের পাশে আরও ঘন হয়ে বসে সোহিনী।

'আই অ্যাম অ্যান অ্যানার্কিস্ট ইনসাইড দ্য ইউনিফর্ম। কিন্তু তুমি কীভাবে? তোমাদের তো জিতনা দূর তক নজর যায়ে, মেরা হি জমিন, তাহলে?'

'আই হ্যাভ সিন দ্য এক্সপ্লয়টেশন ফ্রম আ ক্লোজ প্রক্সিমিটি।'

'এরপর? হোয়াট নেক্সট?'

'আমি জানি না সৌরভ। শুধু জানি এই সমাজের জন্য ভাল কিছু করে যেতে হবে। যার সবটা সিস্টেমে হবে না।'

সোহিনী মানেই একটা হলকা। এই হরিয়ানভি মেয়েটি তপ্ত বাওড়ের মত। সৌরভ জানে এই গরম হাওয়ার হলকায় পুড়ে যেতে হবে এখন। এখন, এই মর পৃথিবীতে কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ব্যারেজ থেকে ছাড়া জলের কুলকুল আওয়াজ ছাড়া।

এই ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দের মধ্যে একটি গম রং মেয়ে। মেয়েটির ঘোড়ার লেজের মত চুল। শরীরে স্বর্গের সুগন্ধ।

২২

ভগবান দাস বেহালাবাদকের আজ বড় আনন্দের দিন।

আজ আমিন মিয়াঁকে সম্বর্ধনা দেবে অল্পবয়েসি ছাওপাওয়ালের দল। ভারি সরেস একখান নাম দিসে বটে গানের দলটার। 'ভার্জিন মোহিতো'। নামের আগামাথা কিছু বোঝে নি ভগবান। জন্নতকে জিজ্ঞেস করায় বলেছিল,

'এ একপ্রকার বিনা মদের ককটেল, ভগবানদা। তুমি বুঝবে না।'

**মধুপুর মেতে আছে এই দ্বৈরথে। একদিকে ডি এম-এর বউ। সঙ্গে অপাপবিদ্ধা, তথাগত এবং সেইসব গাইয়ের দল যাদের গানে নিজের গলা থেকে পাঞ্জাবির গিলা অনেক বেশি। অন্যদিকে আমিন মিয়াঁর বাঁশি, পীযূষের লিরিকে শ্যামসুন্দরের গান। ম্যাডাম ডি এম দু'হাজার কার্ড ছাপিয়েছেন, গ্লসি পেপারে। দেড়হাজার ফুড প্যাকেট, লোকাল কেবল চ্যানেলে টানা বিজ্ঞাপন। ওদিকে 'ভার্জিন মোহিতো' শুধুই ফেসবুকে প্রচার করে গিয়েছে নিজস্ব পেজ থেকে। আরতিরানির সঙ্গে সরকারি মেশিনারি, এদিকে স্রেফ আবেগ।**

'তা বটে, তা বটে। তবে শুধু মদ হলেও কোনও অসুবিধা ছিল না। সুরও তো একরকমের মদ, না বোঝোনের কী আছে?'

'তা নেই তবে একদিন ভার্জিন মোহিতো খাওয়াব তোমাকে।'

'না রে বেটি, নাই মদের গ্লাসে আমার নেশা হবে না। যদি খাওয়াবিই তাহলে নেশা হয় এমন জিনিস খাওয়াস', হাসে ভগবান।

'বেশ, যেদিন আমিন মিয়াঁর সম্বর্ধনা দেব আমরা সেইদিনই খাওয়াব তোমাকে। ভার্জিন নয়, শুধুই মোহিতো।'

তো আজ সেই দিন।

কোনও মঞ্চ নয়, পাহাড়পুর মোড়ের পাশে ধান কেটে নেওয়া ফাঁকা মাঠে তৈরি করা মঞ্চে আজ আমিন মিয়াঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। মধুপুর শহরে এমন অনুষ্ঠান কেউ দেখে নি আগে। আর্ট গ্যালারির বাইরেও যে এমন অনুষ্ঠান হতে পারে, সেটাই করে দেখাবে আজ 'ভার্জিন মোহিতো'। ম্যাডাম ডি এম শ্রীমতি আরতিরানি একটি পালটা কবিতাপাঠ এবং গানের আয়োজন করেছেন। আর্ট গ্যালারিতেই। এই ভার্জিন মোহিতোর ছেলেমেয়েগুলোকে একদম দেখতে পারেন না উনি। একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। পেছনপাকা ছেলেমেয়ে সব।

মধুপুর মেতে আছে এই দ্বৈরথে। একদিকে ডি এম-এর বউ। সঙ্গে অপাপবিদ্ধা, তথাগত এবং সেইসব গাইয়ের দল যাদের গানে নিজের গলা থেকে পাঞ্জাবির গিলা অনেক বেশি। অন্যদিকে আমিন মিয়াঁর বাঁশি, পীযূষের লিরিকে শ্যামসুন্দরের গান। ম্যাডাম ডি এম দু'হাজার কার্ড ছাপিয়েছেন, গ্লসি পেপারে। দেড় হাজার ফুড প্যাকেট, লোকাল কেবল চ্যানেলে টানা বিজ্ঞাপন। ওদিকে 'ভার্জিন মোহিতো' শুধুই ফেসবুকে প্রচার করে গিয়েছে নিজস্ব পেজ থেকে। আরতিরানির সঙ্গে সরকারি মেশিনারি, এদিকে স্রেফ আবেগ। মধুপুরের তরুণ তরুণীরা নিজেদের সঙ্গে রিলেট করে ফেলেছে এই গানের দলটির সঙ্গে। ভাষা, বয়েস এবং আবেগের সঙ্গে। এ এক জমাটি খেলা। শহরের বাঁধা প্রধান এবং বিশিষ্ট অতিথিরা বেশ দ্বিধায় কারণ 'ভার্জিন মোহিতো'-র অনুষ্ঠানে কোনও অতিথি নেই। সরাসরি আমন্ত্রণও নেই। একজন রাজবংশী দিনমজুর উদ্বোধন করবেন এই সম্বর্ধনার আসর। আর ওদিকের উদ্বোধক ডি আই জি সাহেব। শোনা যাচ্ছে ডি আই জি সাহেব যখন প্রদীপ জ্বালাবেন তখন নাকি ডি জে বক্সে 'টুনির মা' বাজবে। লালপাড় সাদা শাড়ির পঞ্চাশজন মেয়ে একসঙ্গে থালি গার্লের ভূমিকায়। গোটা কুড়ি চোং সেই আওয়াজ ছড়িয়ে দেবে ডিবিসি রোড থেকে কেরানিপাড়া অবধি।

সন্ধেবেলায় পাহাড়পুর মোড়ের চারদিক লোকে লোকারণ্য।

হাতে গিটার এবং অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে ছোট ছোট জটলায় কমবয়েসি ছেলেমেয়েরা নিজেদের মত করে গাইছে, নাচছে। আসলে এই অনুষ্ঠান এখন আর জন্নত, অরিত্র, জোজো, মহুয়া আর কুনালের অনুষ্ঠান নেই, একটা উৎসবের মাহোল তৈরি হয়ে গেছে। বাঁশির ভিডিও ক্লিপ ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমিন মিয়াঁ একটা ফেনোমেনন। আজকাল পীযূষের কথা, মিয়াঁর বাঁশি আর শ্যামসুন্দরের গান সবার মুখে মুখে ফিরছে। মাটির কথা, ভাটিয়ালি টান আর রক ধাঁচে গাওয়া এইসব গানের ভেতর কত যে না-বলা কথাও লুকিয়ে আছে বিট্যুইন দ্য লাইনস এমনকী কলকাতা, বাঁকুড়ার কলেজ সোস্যালগুলোতেও ওদের গান গাইছে ছাত্রছাত্রীরা। 'ভার্জিন মোহিতো'র গানও সমান জনপ্রিয়। মধুপুরেও আজ তার বত্যয় হয় নি।

মাটির মঞ্চটা অসাধারণ। পুরনো বাড়ির সামনে আড্ডা দেওয়ার রকের মত করে বানানো। মাটি থেকে সামান্য উঁচু। স্টেজ নাও বলা যায় আবার বললেও অত্যুক্তি হবে না। ব্যাকড্রপে একটি মাটির দেওয়াল। দেওয়ালে ট্রাইবাল মোটিফ আলপনা দিয়ে আঁকা। মঞ্চের একদিকে কয়েকটা চেয়ার বাকিটা ধান কেটে নেওয়া মাটির ওপরে সতরঞ্চি বিছানো। আসলে আয়োজনের তোয়াক্কা না করে দর্শকেরা নিজের মত করে সেট হয়ে যাচ্ছে। এখন মাইকে জন্নতরা গাইছে। একটু বাদেই এলাকার দিনমজুর দুলেন রায় উদ্বোধন করবেন মূল অনুষ্ঠানের।

ইলা ব্যানার্জি এসেছেন এই আয়োজনে। সঙ্গে আরাত্রিকা। মধুপুর শহরের অনেক বিশিষ্ট মানুষেরাও আজ পাহাড়পুর মোড়ে। দুলেন রায় প্রদীপ জ্বালানোর সময় গোটা মধুপুর জুড়ে শঙ্খধ্বনির আওয়াজ। দূরে দাঁড়িয়ে দুজন সাদা পোষাকের অফিসার বেশ বিস্মিত,

'কেসটা দেখেছেন বড়বাবু, সব কেমন অগোছালো অথচ কী অদ্ভুত সিনক্রোনাইজেশন!'

'দেখেছি স্যার, ভেতরে একটা বড় খেলা আছে

মনে হচ্ছে।'

'এই যে শ্যামসুন্দর নামের ছেলেটা গাইছে, গানের কথাগুলো শুনুন। আপাত নিরীহ অথচ কেমন আগুন লুকিয়ে আছে। দিস ইজ অর্ডার উইদিন আ ডিসঅর্ডার, বড়বাবু', সদর ডি এস পি সিগারেট ধরান।

'কিন্তু স্যর, এটা তো একটা সমোস্কিতিক রেষারেষি, একদিকে ডি এম ম্যাডাম অন্যদিকে এই ছেলেছোকরা সব।'

'সহজ নয়, আই সি সাহাব, অত সহজ নয়। প্যাটার্নটা বুঝুন। একদিকে একটার পর একটা ধামাকা ঘটে যাচ্ছে অন্যদিকে এই ভার্জিন মোহিতো। এদের অনুষ্ঠানে ভিড় দেখেছেন? তাও শুধু ভার্চুয়াল প্রচারে। কোনও ফ্লেক্স নেই, কার্ড নেই, মাইকিং নেই...তবু।'

'হ্যাঁ, স্যর। কারখানা উড়ে গেল, চম্পাসারিতে মদের গাড়ি লুঠ হয়ে গেল, রিসর্ট তছনছ থেকে হরেন কুণ্ডুর ডেরায় রেইড। কয়েকমাসের মধ্যে এলাকায় চাকরি করাটাই কঠিন হয়ে গেল।'

'প্যাটার্ন বড়বাবু, প্যাটার্ন। এদের কোনও প্রচার নেই অথচ আমিন মিয়াঁ আর ভার্জিন মোহিতো-র টিজার দ্য নিজ এজ ডেইলির মত ন্যাশনাল নিউজপেপারের পোর্টালে। 'খবরিলাল' তো এই পীযূষ ছেলেটাকে মেসিহা বানিয়ে দিয়েছে।'

'আজকাল থার্ড ডিগ্রি উঠে গিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে, স্যর', বড়বাবুর গলা হতাশ লাগে, 'আগেকার জমানা হলে থানায় নিয়ে এসে উলটে পেটালেই সব উগরে দিত।'

'এদের সবার ওপর সার্ভেইল্যান্স আছে মিত্র, কিন্তু কোনও ফুটপ্রিন্ট নেই। নিট কাজ। আসলে এত পরিছন্ন কথাবার্তা শুনলেই সন্দেহ হয় আমার।'

'আমি স্যর অত বুঝি না তবে পার্টির খোদ লোকের এলাকায় অন্য জেলার ফোর্স এসে কাজ করে চলে গেল। ইন্ডিয়া জুড়ে খবর হয়ে গেল রাতের মধ্যে আর আমরা কিছুই বুঝলাম না!'

'তার চাইতেও বড় ব্যাপার ওপর থেকে কোনও চাপ নেই। রুলিং পার্টির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে মনে হয়। তবে সেই ফাঁকা জায়গা কারা নিচ্ছে মিত্র? পৃথিবীতে জায়গা ফাঁকা থাকে না। রুল অফ ইউনিভার্স।'

যখন আমিন মিয়াঁর বাঁশির সুর খেলা করছে মধুপুর শহরের বাতাসে, যখন পীযূষের লেখা গানের কথায় উদ্বেল হয়ে উঠছে সামনের জনতা, যখন আরাত্রিকা নিঃশব্দে ভিডিও করছেন এই গানবাজনার এবং যখন ভগবান দাসের দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাঁধ না মানা অশ্রু ঠিক তখনই একটু ভেতরে স্টেডিয়ামের দিক থেকে ভেসে এল একাধিক বীভৎস

**সেই পাট পাট সাদা সুতির শাড়ি। মোটা কাপড়ের সুতির ব্লাউজ, কনুই অবধি। ভেতরের ব্রা দেখা যায় না এমন মোটা কাপড়। মুখে কথা নেই, স্মিত হাসিটি আছে। এক একটা দুপুরে সাবিত্রীর মন খারাপ হয়। আজ তেমনই একটা দুপুর। একটু আগেই হাতির দল ঘুরে গেছে কলা আর লেবু বাগানের মধ্যেকার রাস্তাটি দিয়ে। কয়েকটা অবুঝ বাচ্চা হাতি না জেনে লেবু বাগানের ভেতরেও ঢুকে পড়েছিল। গায়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে আবার বেরিয়েও গেছে সাততাড়াতাড়ি। লার্নিং প্রসেস।**

আওয়াজ। গুলি এবং বোমার শব্দ। এই অনুষ্ঠান এখন শেষের দিকে। হুড়োহুড়ি শুরু হওয়ায় জন্নতরা সামান্য আগেই গুটিয়ে ফেলল সব কিছু।

গোশালা মোড়ের ওপর একটা ইয়েজদি মোটরবাইকে তিনজন মানুষ ঘরে ফিরছে তখন। মংরা, পলাশতরু নিয়োগী আর বাপ্পা দেব। আজ কোনও রাফ ঢালাই হয় নি। স্মরণাতীত কালের মধ্যে এই প্রথম। আজ কাজ ছিল। কাজ হয়ে গেছে এখন বাড়ি ফেরার সময়। 'বাচ্চারা' কাজ করে ফেলেছে।

স্টেডিয়ামের পাশে দুটো স'মিল এখন দাউদাউ করে জ্বলছে। এই গোশালা মোড় থেকেও দেখা যাচ্ছে কমলা রং-এর শিখা। 'ফুটবলার'রা এতক্ষণে ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগানে পৌঁছে গেছে। তিন বন্ধুই টেনশন ফ্রি। এখন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বোতল খোলা হবে। এখন রাফ ঢালাইয়ের সময়।

পুলিশের জিপসি থেকে নেমে ডি এস পি সাহেব বড়বাবুকে বললেন,

'প্যাটার্ন, মিত্র, প্যাটার্ন। বুঝলেন কিছু?'

সামনে আগুনের দাউদাউ শিখা, দমকলের চারটা ইঞ্জিন কাজে নেমে পড়েছে। কিন্তু চেরাই কাঠ আর শুকনো লগের আগুনকে বাগে আনা যাচ্ছে না সহজে। বড়বাবু কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না,

'স্যর, এই দুটো স'মিলই তো বেআইনি। ডুয়ার্সের চোরাই কাঠের একটা সিংহ ভাগই এখানে সাইজ হত। সব মান্থলি করা ছিল স্যর। মোটা।'

'মান্থলির দিন ভুলে যান মিত্র।'

'তাই হয় নাকি স্যর? সবাই কি আর আপনার মত সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে? আপনি স্যর ভগবান।'

'ঝড় উঠছে মিত্র, ঝড়। জোরে বাতাস বইবে এখন। মান্থলি ভুলে যান।'

'কী প্যাটার্ন এলো স্যর, পুলিশেও সাধু হয়ে যাবে এখন?'

'সব পুলিশ খারাপ নয়, মিত্র। তবে বাকিরাও সাইজ হয়ে যাবে। প্যাটার্ন বদলাবে।'

সেই পাট পাট সাদা সুতির শাড়ি। মোটা কাপড়ের সুতির ব্লাউজ, কনুই অবধি। ভেতরের ব্রা দেখা যায় না এমন মোটা কাপড়। মুখে কথা নেই, স্মিত হাসিটি আছে। এক একটা দুপুরে সাবিত্রীর মন খারাপ হয়। আজ তেমনই একটা দুপুর। একটু আগেই হাতির দল ঘুরে গেছে কলা আর লেবু বাগানের মধ্যেকার রাস্তাটি দিয়ে। কয়েকটা অবুঝ বাচ্চা হাতি না জেনে লেবু বাগানের ভেতরেও ঢুকে পড়েছিল। গায়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে আবার বেরিয়েও গেছে সাত তাড়াতাড়ি। লার্নিং প্রসেস। এভাবেই ওরা শিখে নেয় সবকিছু। তবে যূথবদ্ধ ঐরাবতের এই মাতামাতিতে এই তল্লাট এখন ভরে গেছে লেবুপাতার ঘ্রাণে। মাতাল করা সুবাস। লেবুপাতার ঘ্রাণের থেকে ভাল কোনও সুগন্ধি এখনও তৈরি হয় নি। তবে এখন এসব ভাববার সময় নয়। আজ 'বাচ্চারা' আসবে। বাচ্চাদের জায়গা বানানোর দায়িত্ব ওর আর সুরেশ তামাং-এর।

অনেকদিন বাদে এইসব যন্ত্রপাতি দেখে সুরেশের রক্তের গতি বেড়ে গেছে। সেই কতদিন হল আর্মি ছেড়ে চলে এসেছে। তবে এত আধুনিক যন্ত্রপাতি তখন ছিল না। দেখে আর অবাক হয় সুরেশ। চুট্টায় টান দেয় ঘনঘন,

'এতি রামরো মেশিন হামরো সময় মা ভয়েকো ভা!'

'কী করতে?'

'জোশ আসত রে বেটি, প্রত্যেক শটের পর ছিটকিনি টেনে নতুন বুলেট ভরতে হত না।'

সাবিত্রী এতকিছু বোঝে না তবে বৃদ্ধের চকচকে চোখ দেখে মনে হয় এই ঠান্ডা ইস্পাতের প্রতি অনেক মোহ এখনও মনে পুষে রেখেছে সুরেশ তামাং।

মোটা প্লাস্টিক শীট দিয়ে গোটা আটেক লং রেঞ্জ আর দুই বাক্স দানা প্যাক করে সুরেশ। তারপর মাটির বেশ খানিকটা নিচে পুঁতে রাখে। মাটি সমান করে দূরের বীজতলা থেকে সদ্য গজিয়ে ওঠা ঢ্যাঁড়শ চারা এনে রোপণ করে সারি দিয়ে। কে বলবে এমন নিরীহ ভেন্ডি গাছের নিচে অমন কালান্তক সব যন্ত্রপাতি শুয়ে আছে! কাজ সারা হলে অনেকদিন বাদে পাশের বস্তি থেকে হাঁড়িয়া নিয়ে আসে সুরেশ। দুপুরের রোদ আর ভাত পচা পানীয়ের গুনে অসময়ে রেডিও খোলে সুরেশ। এই ঘুঘুডাকা দুপুরে টিলার ওপর গা এলিয়ে সুরেশ তামাং। পাশের সন্তোষ টেপ রেকর্ডার থেকে লতা রফি ডুয়েট। সাবিত্রীর আকণ্ঠ তেষ্টা পায়। বন্দুকগুলো দেখার পর থেকেই হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে ওর। তবে এও ক্ষণিকের, সামলে নেবে খানিক বাদেই। শিখেও নিতে হবে অনেক কৌশল। হিসেব মিটিয়ে নেওয়া বাকি আছে।

হিসেব বাকি রাখতে নেই। প্রতিশোধ ঠান্ডা হয়ে এলেই স্বাদ বাড়ে।

*(এরপর আগামী সংখ্যায়)*

# ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

## ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

**রোবনামচা**। তপন রায় প্রধান। ১৯৫ টাকা
**তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা**। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
**ডুয়ার্স থেকে দিল্লি**। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
**চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?** গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
**ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?** সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
**আলিপুরদুয়ার**। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
**কোচবিহার** ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
**জলপাইগুড়ি**। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
**এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০**। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
**গণ আন্দোলনে কোচবিহার**। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
**রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা**। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
**শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ**। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
**কথায় কথায় জলপাইগুড়ি**। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
**আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি**। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

## ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

**পঞ্চাশে ৫০**। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ২৫০ টাকা
**ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো**। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
**চারপাশের গল্প**। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
**লাল ডায়েরি**। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
**সব গল্পই প্রেমের নয়**। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
**দিল সে দিল্লী সে**। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

## ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

**ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস**। সংকলন। ১৯৫ টাকা
**তরাই উৎরাই**। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
**লাল চন্দন নীল ছবি**। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
**শালবনে রক্তের দাগ**। ১২৫ টাকা
**অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন**। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
**মেঘের পর রোদ**। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
**কুহুলিয়াদের দেশে**। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

## ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

**বিসমিল্লার সানাই চৌরাশিয়ার বাঁশি**। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
**পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান**। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
**ডুয়ার্সের হাজার কবিতা**। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
**বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক**। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

## বিষয় পর্যটন

**আমাদের পাখি**।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
**সিকিম**। সংকলন। ২০০ টাকা ***
**নর্থ ইস্ট নট আউট**। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
**রংরুটে হিমালয় দর্শন**। সংকলন। ২০০ টাকা ***
**উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে**। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
**সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে**। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
**মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে**।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
**সুন্দরবন অনধিকার চর্চা**।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

**প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন**। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
**জয় জল্পেশ**। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

**অরণ্য কথা বলে**।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
**সে আমাদের বাংলাদেশ**।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
**পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়**।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
**তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত**।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
**মুর্শিদাবাদ**। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
**বাংলার উত্তরে টই টই**। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

## বিষয় নাটক

**নাট্য চতুষ্টয়**। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
**নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ**। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
**বাঙ্ময়**। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

## শুরু হল ছোটদের সিরিজ

**গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি**। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
**ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া**। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
**হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে**
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
**পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।**

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

# চারুকেশী চলে গেল

অরণ্য মিত্র

চারু আজ পালাবে।

ভুবন গোপ পুকুরের পশ্চিমে নন্দবাবুর বাগানে অপেক্ষা করছিলেন। পাশাপাশি দুটো পুকুর। একটা নন্দবাবুর পরিবারের ব্যবহারের জন্য। দ্বিতীয়টি গ্রামের সবাই ব্যবহার করতে পারে। প্রথম পুকুরটির ঘাট সুন্দরভাবে বাঁধান। ভুবন গোপ দাঁড়িয়ে আছেন তার পশ্চিমে। রাত তিন প্রহর শেষের ঘণ্টা একটু আগে নন্দদুলাল দত্তের দেউরিতে বেজে গেছে। দত্ত বাবু বলতে গেলে এই গ্রামের মাথা। চারুকেশী তাঁর মেজ মেয়ে। বাল্য বিধবা। গ্রামের সম্পন্ন ঘরের এই রকম বাল্য বিধবা, কুড়ি পেরিয়ে যাওয়া অবিবাহিতা মেয়েদের খুব কঠোর জীবন যাপন করতে হয়। অনেক সময় গর্ভবতী হয়ে পড়ার কারণে অথবা নিকটজনের লালসার শিকার হওয়ার কারণে যে সব মেয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তাঁরাও কেউ কেউ পালায়।

ভুবন গোপ এই সব পলায়নেচ্ছুক মেয়েদের খোঁজ খবর রাখে। তাঁর বিরাট যোগাযোগ। মেয়েদের সে নিয়ে যায় ফুলবাই-এর কাছে। সেখানে মেয়েরা স্বাধীন জীবনের সন্ধান পায়। ভদ্র পরিবারের মেয়েরা অতীত জীবনের দুঃস্বপ্ন ভুলে গিয়ে দু-হাতে উপার্জন করে রানির মত থাকে। তিন বছর আগে হেমবালা নামের একটা মেয়েকে বর্ধমান থেকে নিয়ে গিয়েছিল ভুবন গোপ। ফুলবাই-এর কাছে ছ-মাস থাকার পর সে এমন আগুন হয়ে উঠল যে হরগোপাল মল্লিক তাঁকে চড়া দক্ষিণা দিয়ে নিয়ে গিয়ে তুললেন ভবানীপুরের এক বাগান বাড়িতে। বুড়ো হরগোপাল ক-দিন আগে স্বর্গে গিয়েছেন। বাগান বাড়ি তিনি লিখে দিয়ে গেছেন হেমবালাকে। অবশ্য হেমবালার নাম এখন কুসুমলতা। তাঁকে এবার পাওয়ার জন্য নিউ মর্ডান অপেরার মালিক ভূষণকুমার একেবারে খেপে উঠেছেন।

চারুকেশীর জীবনও এমন হতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন ভুবন গোপ। দত্তবাড়ির মেয়েদের চট করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এই গ্রামে ভুবন গোপের গুপ্তচর হল খেমি। বর তাঁকে নেয় না। খেমি মন্দিরের ঠাকুরমশাই-এর ফাইফরমাস খেটে দিয়ে

বিনিময়ে মন্দিরের রান্নাঘরে ঘুমোয়। আশপাশের কয়েকজন মেয়ে তাঁর মাধ্যমেই ভুবন গোপের সহায়তায় পালিয়ে গেছিল। তবে তাঁরা ছিল সবাই গরীব ঘরের মেয়ে। এই ধরনের মেয়েদের জন্য ফুলবাই অল্প টাকা দেয়। চারুকেশীদের পেলে ভালই প্রাপ্তি হয় ভুবন গোপের।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মাঝরাত পার করে উঠেছে। বৈশাখ মাসের রাত শেষ হতে বাকি নেই। মলিন জ্যোৎস্নায় ভুবন গোপের চোখে এখনও কেউ পড়ে নি। খেমি একটু দূরে বসে বসে ঢুলছে। তৃতীয় প্রহর শেষ হলেই চারুকেশী বেরিয়ে এসে পুকুর ঘাটে আসবে। ভুবন গোপ তাঁকে নিয়ে যাবে গঙ্গার ঘাটে। সেটা প্রায় এক মাইল। ঘাটে আজিম মিঞা নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাঁরা গেলেই স্রোতের অনুকূলে ভেসে পড়বেন। কাল দুপুরের আগেই ফুলবাই-এর বর্তমান বাসস্থানের প্রাইভেট ঘাটে নৌকো লাগিয়ে দিতে পারবে সে।

'মাগীটা দেরি করছে কেন বল তো?'

খেমির কাছাকাছি এসে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন ভুবন গোপ। খেমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একনো আসলো নি?'

'আকাশ ফর্সা হতে দেরি নেই। আসবে তো?'

'আসবে বলে তো একমাস ধরে গতর বানাচ্চে গা! নুকিয়ে তেল মাকচে। আরেট্টু রোসো। ঠিক বেরুবে।'

সত্যি সত্যিই কয়েক মিনিট পর একটা ছায়ামূর্তিকে পুকুরের ওধারের গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। খেমি এগিয়ে গিয়ে হাতছানি দিল কয়েকবার। তাঁকে দেখতে পেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ছায়ামূর্তি। কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা। কাছে এসে মাথার কাপড় সরিয়ে মুখটা বের করল। মলিন জ্যোৎস্নায় ভুবন গোপ দেখল একটি ফুলের মত নিষ্পাপ মুখ। কদমছাঁট চুল সে মুখের সৌন্দর্যকে একটু ম্লান করে দিয়েছে বটে, তবুও তাকিয়ে থাকার মত মুখ।

'চারুদি।' খেমি সনাক্ত করল মুখটিকে।

'চলুন।' দেরি না করে হাঁটা দিল ভুবন গোপ। তাঁর মন বেশ ফুরফুরে হয়ে গেছে। চারুকেশীকে দেখে ফুলবাই কতটা খুশি হবে, সেটা সে ভাবতে ভাবতে হাঁটতে শুরু করল। বেশ দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল ঘাটে। চারুকেশী তাঁকে নিঃশব্দে অনুসরণ করেছে। খেমিও এসেছে ঘাট অবধি। সে অবশ্য ফিরে যাবে।

মূল ঘাটের থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে দাঁড়াল ভুবন গোপ। পাড় থেকে নদীতে নামার জন্য জায়গাটা একটু দুর্গম বলে এখানে নৌকো ভেড়ায় না কেউ। চাঁদের আলোয় চিক চিক করা গঙ্গার জলে অপেক্ষমান নৌকোটা দেখা যাচ্ছিল। ভুবন গোপ ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা খেমির হাতে দিয়ে বললেন, 'খুশি তো?'

দু-টাকা পাওয়ার আনন্দে খেমির চোখে জল এসে গেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আর দেকা হবে নি চারুদি। পাল্লে আমার জন্নি কিছু করিস!'

চারুকেশী শরীর থেকে কালো কাপড়টা খুলে খেমির হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দে খেমি। গায়ে দিলে আমার কথা মনে পড়বে।'

এখন চারুকেশীর পরনে একটা সাদা কাপড়। একটা কাঁধ সমেত একটা হাত সম্পূর্ণ নগ্ন। গঙ্গার হাওয়ায় আঁচলটা সরে সরে যাচ্ছিল। অন্তঃপুরে মহিলারা গরমের দিনে যেমন ফিনফিনে কাপড় পরে থাকে, চারুকেশী সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে এসেছে। তাঁর সুডৌল বুকের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে চোখ সরিয়ে নিয়ে ভুবন গোপ বললেন, 'মাথাটা ঢেকে নিন। নৌকোয় চাদর আছে। গায়ে দিয়ে নেবেন। ঠান্ডা লাগবে।'

চারুকেশী মলিন হেসে খেমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই যা খেমি।'

খেমি যেন এই কথাটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ফিরে যাওয়ার জন্য দৌড় দিল সে। দুটো চকচকে টাকা এখন তাঁর মন জুড়ে। কে চারুদি?

তাঁকে জ্যোৎস্নামাখা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখার পর চারুকেশী চুপ করে কী জানি ভাবতে লাগল। সময় চলে যাচ্ছে একটু একটু করে। ভুবন গোপ চাইছিলেন নৌকোয় উঠে পড়তে। তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ঘাটে নামার সময় আমার হাত ধরে নামলে ভাল হয়।'

চারুকেশী কোনও আগ্রহ দেখাল না। হাওয়ার ধাক্কায় কাঁধের থেকে আঁচল পিছলে নেমে গেছে। চারুকেশী সেটা শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলেছে মুঠোর মধ্যে। আধখোলা দুটি বক্ষ চুম্বকের মত টানছিল ভুবন

গোপের চোখ। তবে তিনি যে ধরনের কাজ করেন তাতে জিতেন্দ্রিয় না হলে চলে না। তিনি নদীর দিকে তাকিয়ে একটু কড়া সুরে বললেন, 'হাতটা ধরুন।'

'আমার যাওয়া হবে না গোপ মশাই!' চারুকেশী মৃদু অথচ দৃঢ় সুরে বলল।

'মানে?' ভুবন গোপ অবাক হলেন। 'আপনি যাবেন না?'

'পারব না।'

'এখন আর কোনও উপায় নেই।' ভুবন গোপ বিরক্তি চেপে রেখে ঠান্ডা গলায় বললেন। 'আর ফিরে গিয়েই বা কী করবেন? গতরের জ্বালা পুষে রেখে দত্তবাড়ির অন্দরমহলে দগ্ধে দগ্ধে মরার চাইতে কলকাতায় রানির মত বাঁচা অনেক ভাল।'

'বড় মানুষের রাঁঢ় হতে গেলে যা লাগে তা আমার আছে?' চারুকেশী একটু এগিয়ে এল। হাত বাড়ালেই তাঁকে ছুঁতে পারে ভুবন গোপ। তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'খারাপ ভাববেন না। এই লাইনে গতরের দাম অনেক। আমার সে বিষয়ে ধারণা নেই। তবে পুরুষ মানুষের ধারণা থেকে এটুকু বলতে পারি কলকেতার বাবুদের পায়ের নিচে রাখার যোগ্যতা আপনার আছে।'

'আছে?' ভুবন গোপকে চমকে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল চারুকেশী। মুঠো আলগা করতে আঁচলটা মাটিতে পড়ে হাওয়ায় লুটোপুটি খেতে লাগল। ঘাবড়ে গিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন ভুবন গোপ।

'আমি অনেক ভেবেছি।' চারুকেশী আবার মৃদু গলায় কথা বলছে। 'যেদিন থেকে স্থির করেছি আপনার সাথে পালাব, সেদিন থেকেই শরীরে জোয়ার আসতে শুরু করেছে। ক-দিন আগে দূর সম্পর্কের ভাই এসেছে বাড়িতে। কাল আমাকে জাপ্টে ধরেছিল। সুবিধে করতে পারে নি বলে এক পিসিকে দিয়ে বাবাকে বলিয়েছে আমি তাঁকে চেয়েছিলাম। কী কপাল বলুন! কালকেই ঘটতে হল ঘটনাটা?'

'ঠিক আছে।' ভুবন গোপ একটু চাপে পড়ে গেলেন। মেয়েটা পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো? 'আপনি কাপড়টা ঠিক করে নিন। নৌকোয় বসে বাকিটা শুনব। আপনাকে কি তবে বাড়ি থেকে তাঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

আঁচলটা আবার গায়ে জড়িয়ে চারুকেশী দু-দিকে শান্ত ভাবে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি বাবাকে বললাম, পালিয়ে যাব। সূর্যোদয়ের আগেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। আমি তো জানতাম আপনি থাকবেন। খেমি সব বলে রেখেছে। কিন্তু বাবা বললেন, ঘরের মেয়ে পরপুরুষের রাঁঢ় হয়ে ফুর্তি লুটবে— এমন হওয়ার আগে যেন তাঁর মরণ হয়। এরপর কী করে যাই বলুন?'

'বাপেরা অমন বলে। তবে এ লাইনে আমিও তো অনেক রঙ্গ দেখলাম। ঘরের মাগী বেবুশ্যে হয়ে গেছে জন্য কোনও বাপকে মরতে দেখি নি। উল্টে মেয়ের নামে শ্রাদ্ধ করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করে লোক ডেকে খাওয়ায়। ওসব আর ভাববেন না। এখন দয়া করে হাতটা ধরুন। ভোর হয়ে এল। এতসব যখন ঘটেই গেছে তখন আর পিছুটান কী?'

চারুকেশী কিছু বলল না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকল প্রবহমান গঙ্গার দিকে।

'কী হল?' অসহিষ্ণু সুরে প্রায় ধমকে উঠলেন ভুবন গোপ। 'যে কাহিনী শোনালেন তাতে তো ফিরে গিয়ে গলায় দড়ি দিতে হবে!'

চারুকেশী নদীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল ভুবন গোপের দিকে। তাঁর চোখে কি জল? ভুবন গোপের বিরক্তি ক্রমশ বাড়ছে। এবার একটু চিৎকার করে বললেন, 'যান! তবে গলায় দড়ি দিন গে! ফালতু দুটো টাকা জলে গেল!'

চারুকেশী ম্লান হেসে বলল, 'বাবা সেটাই বলেছিলেন। গলায় দড়ি দিতে। আমি দিলাম।'

ভুবন গোপ স্থির হয়ে গেলেন। সাদা কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি নগ্ন শরীর। মলিন, হলদে চাঁদের আলোয় সেই নগ্ন চারুকেশী ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে। একটু একটু করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর। মিশে যাচ্ছে মৃত জ্যোৎস্নায়। এক সময় হলুদ জ্যোৎস্নায় পুরোপুরি মিলিয়ে গেল সেই দেহ। পড়ে রইল কেবল হাওয়ায় লুটোপুটি খাওয়া সাদা কাপড়।

'আমার আর যাওয়া হল না।'

হাওয়ায় ভেসে আসা দেহহীন চারুকেশীর শেষ বাক্যটি শুনতে পেলেন ভুবন গোপ।

# ল্যাব ডিটেকটিভ

## নিখিলেশ রায় চৌধুরী

সাহিত্যে ডিটেকটিভদের রহস্যভেদ পড়তে ভাল লাগে। বাস্তবে অপরাধী খুঁজে বের করতে পুলিশকে পরিশ্রম করতে হয়। তদন্তে নামার পর অনেক সময় ক্লু হারিয়ে যায়। সেই ক্লু খুঁজে বের করেন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এমন কিছু কেস এখানে তুলে দেওয়া হল, যেগুলির অপরাধী ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতেই ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও থাকছে একাধিক ইন্টারেস্টিং কেস।

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে এমন কিছু আবিষ্কার দেখা গেল, অপরাধীরা ভয় পেয়ে গেল। ফোরেনসিক সায়েন্সের তাক লাগানো সফলতায় জাত ক্রিমিন্যালদের পেটে টান পড়ল। কোথায় গেল সব সোনার দিন, এই বলে বিলাপ করা ছাড়া তাদের আর উপায় রইল না। অপরাধের তদন্তে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি আর প্যাথোলজি কাজে লাগিয়ে এমন একটা যুগের সূচনা বিজ্ঞানীরা করলেন, যেখানে অপরাধীদের খাবি খাওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনের গোড়ার দিকে কোনও ব্যাংক লুটেরা যেমন ভাবতেও পারে নি, আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভল্টের গায়ে একটা আঙুলের ছাপ তাকে ফাঁসিতে চড়াবে। ঠিক তেমনই, 'সত্তরের দশকে'র কোনও খুনি কল্পনাও করে নি আর এক দশকের মধ্যেই এক ফোঁটা রক্ত থেকে গোয়েন্দারা তার জেনেটিক মেক-আপ জেনে যাবেন। তার নামে হুলিয়া বের হবে। নাম ভাঁড়িয়ে পালিয়ে বেড়ালেও পুলিশ তাকে ধরে ফেলবে।

অপরাধ জগতে বিজ্ঞান প্রয়োগ করার আগে পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের ধরা কষ্টকর ছিল। পুলিশের নাগালে এসেও তারা হাত ফসকে পালিয়ে যেত। অপরাধীকে খুনের অস্ত্র কিংবা চোরাই মালসুদ্ধ পাকড়াও করা না গেলে, কিংবা অপরাধীর অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর সঙ্গে আক্রান্তের মরণপণ লড়াইয়ের চিহ্ন অভিযুক্তের শরীরে পাওয়া না-গেলে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী অধরাই থেকে যেত।

এই অবস্থায়, ১৮৬৪ সালের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গোটা বিশ্বে অপরাধী শনাক্তকরণে পুলিশের কাজ অনেক সহজ করে দিল। ঘটনাটা ঘটেছিল কলকাতাতেই।

ব্রিটিশ রাজ-কর্মচারী উইলিয়াম হার্শেল পরীক্ষা করে দেখলেন, দুটো আঙুলের ছাপ কখনই মেলে না। তিনি আনপড় সিপাহিদের পেনশন দেওয়ার জন্য টিপ-ছাপ নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পেনশনের দিন ডান হাতের তর্জনির ছাপ নিয়ে টাকা দেওয়া হত।

কয়েক বছর বাদে উইলিয়াম হার্শেলের এই পদ্ধতি আরও উন্নত করলেন এক নাছোড়বান্দা স্কট।

হেনরি ফল্ডস। ১৮৮০ সালে 'নেচার' ম্যাগাজিনে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন যে, আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী শনাক্ত করা যায়।

আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ পদ্ধতি কার 'আবিষ্কার', এ নিয়ে বেশ কিছু দিন ফল্ডস আর হার্শেলের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা চলল। কিন্তু 'আবিষ্কর্তা' যেই হন না কেন, দুষ্কৃতী পাকড়ানোর ফিঙ্গারপ্রিন্ট গোয়েন্দাদের কাছে মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে গেল।

কিন্তু অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে ধরার ক্ষেত্রে বাস্তবে যিনি আঙুলের ছাপ প্রথম কাজে লাগালেন, তিনি স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন। ১৮৯২ সালে তাঁর বই বের হল। 'ফিঙ্গার প্রিন্টস'। সেই বইতে তিনি নমুনা তুলে দেখালেন, দুটো আঙুলের ছাপ কখনই এক রকম হয় না।

ওই বছরেই আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে পুলিশ অপরাধী ধরল।

বিলেত-আমেরিকা কিংবা ইউরোপে নয়, আর্জেন্তিনার নিকোশিয়ায়।

ফ্রান্সেসকা রোজাস নামে এক মহিলা হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পড়শির কুঁড়েঘরে ঢুকল। বলল, তার চার আর ছয় বছরের দুই সন্তানকে কেউ মেরে দিয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সেসকার বক্তব্য, সে কাজে গিয়েছিল। ফিরে দেখে, বিছানায় তার দুই শিশু মরে পড়ে আছে। ভেলাসকেজ নামে একটা লোকের ঘাড়ে দোষ চাপাল ফ্রান্সেসকা। বলল, ভেলাসকেজ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। রাজি না-হওয়ায় প্রতিশোধ নিতে তার দুই সন্তানকে হত্যা করেছে। পুলিশ ভেলাসকেজ-কে পাকড়াও করল। জবানবন্দি নেওয়ার জন্য তার উপর নির্যাতনও চালাল। ভেলাসকেজ কিন্তু বারংবার বলল, সে নির্দোষ। তদন্তের জন্য লা প্লাটা থেকে আলভারেজ নামে এক পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে গেলেন। আলভারেজ যেটা জানতেন অনেক পুলিশ অফিসারই তখনও তা জানতে পারেন নি।

বুয়েনস আইরেস পুলিশের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর মাথা তখন ক্রোয়েশিয়ার ডালমেশিয়া উপকূলের এক অধিবাসী। জুয়ান ভ্যাসেটিচ। ভ্যাসেটিচ আঙুলের ছাপ নিয়ে স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। সেই লেখা পড়ে উৎসাহী হয়ে ভ্যাসেটিচ বুয়েনস আইরেসে একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম তৈরি করলেন। ভ্যাসেটিচের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা আলভারেজ জানতেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি শার্লক হোমসের মত ক্লু খুঁজতে থাকলেন। চারি দিক ঢুঁড়ে দেখলেন। অবশেষে একটা দরজার উপর রক্তে মাখা বুড়ো আঙুলের ছাপ পেলেন। আলভারেজ দরজার ওই অংশটা কেটে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে গেলেন। ভ্যাসেটিচ সেখানে আঙুলের ছাপটা পরীক্ষা করলেন। এর পর আলভারেজের নির্দেশে পুলিশ গিয়ে নিহত দুই শিশুর মা ফ্রান্সেসকা রোজাসের আঙুলের ছাপ নিল। গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের মত আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করতে না-জানলেও আতশ কাচে দুটি ছাপ দেখে আলভারেজ বুঝতে পারলেন, দরজার গায়ের রক্তমাখা ছাপের সঙ্গে ফ্রান্সেসকার আঙুলের ছাপ মিলে যাচ্ছে। তিনি ফ্রান্সেসকা-কে ডেকে পাঠিয়ে আতশ কাচের নীচে ফেলে দুটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখালেন। ফ্রান্সেসকার মিথ্যা আর ধোপে টিঁকল না। কান্নায় ভেঙে পড়ে স্বীকার করল, দুই সন্তানকে সে-ই খুন করেছে। সে এক যুবকের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু যুবকটি তার দুই সন্তানকে চায় নি। এর মধ্যে ভেলাসকেজ তাকে বিয়ে করতে চেয়ে উত্যক্ত করছিল। ভেলাসকেজকে ফ্রান্সেসকার সহ্য হচ্ছিল না। তাই লেডি ম্যাকবেথের মত সে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। এক দিকে অবাঞ্ছিত প্রেমিক আর অন্য দিকে দুই অবৈধ সন্তানকে সে তার জীবন থেকে এক ঘায়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী চিহ্নিত করার সেটাই প্রথম ঘটনা।

## ২

আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে সেগুলি গুছিয়ে রাখার ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়ল। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অপরাধস্থলে আঙুলের ছাপ তোলার কাজ সহজ করে দিল। এবড়ো-খেবড়ো জায়গায় আগে আঙুলের ছাপ তোলা কষ্টকর ছিল। আয়োডিন আর নিওহাইড্রিন স্প্রে-র সহায়তায় সেই কাজ অনেকখানি হালকা হল।

এমনকী, বিজ্ঞানের আশীর্বাদে ঠোঁটের ছাপ নেওয়াতেও আর অসুবিধা রইল না। গাড়ির গায়েও আঙুলের ছাপ কিংবা ঠোঁটের ছাপ থাকলে অনায়াসে তা তুলে নেওয়া সম্ভব।

একবার আমেরিকায় এক ড্রাইভারকে পুলিশ ঠোঁটের ছাপ দেখে গ্রেফতার করে। সে রাস্তায় একজনকে চাপা দিয়ে মেরে পালিয়ে যায়। পুলিশ গাড়িটি খুঁজে পেলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলার জন্য বিশেষজ্ঞদের খবর দেয়। ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আঙুলের ছাপ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু গাড়ির বাম্পারে একটি ঠোঁটের ছাপ খুঁজে পেলেন। ঠোঁটের ছাপ মিলিয়ে দেখা গেল সেটা খুনি ড্রাইভারেরই ঠোঁটের ছাপ। অপরাধী ধরা পড়ল।

১৯৮৭ সালে আঙুলের একটি মাত্র ছাপ দেখে ব্রিটেনে এক সাংঘাতিক খুনেকে পাকড়াও করে পুলিশ। ২৫ বছরের জন কানান এক মহিলার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাকে রাস্তায় ধরে। জন কানান পুলিশকে বলে, গাড়িটা সে নিলামে কিনেছে। বারংবার বলতে থাকে, কার গাড়ি সে জানে না। যাঁর গাড়ি সেই শার্লি ব্যাংকস তখন নিখোঁজ। কিছু দিন আগেই শার্লি ব্যাংকসের বিয়ে হয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, তিনি আর বেঁচে নেই। পুলিশ তখন ক্লু খুঁজে বেড়াচ্ছে। জন কানানের বয়ানে পুলিশের সন্দেহ গেল না। তারা ব্রিস্টলে কানানের ফ্ল্যাট সার্চ করল। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে কানান নিজে একজন বেসরকারি গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিল। পুলিশকে সে যা বলেছিল বেসরকারি গোয়েন্দাকেও সে একই কথা বলেছিল। গাড়িটা কার, সে জানত না। নিলামে কিনেছে। কার গাড়ি, প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটু খোঁজ নিন। পুলিশ জন কানানের ফ্ল্যাটে সেই ডিটেকটিভের তৈরি-করা রিপোর্টের একটা ফাইল পেল। ফাইলে একটি মাত্র আঙুলের ছাপ মিলল। মৃতার বাড়ি এবং অফিসে পাওয়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে সেই ছাপ হুবহু মিলে গেল। অ্যাভন পুলিশে পল জবিনস নামে এক সিনিয়র ফিঙ্গারপ্রিন্ট অফিসার ছিলেন। তিনিই রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। আঙুলের ছাপ জন কানানের। পল জবিনসের এভিডেন্সের সামনে জন কানানের আর কিছুই করার রইল না। স্বীকার করল, সে-ই শার্লি ব্যাংকসকে ধর্ষণ এবং হত্যা করেছে। জন কানান যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের পর আইনরক্ষকদের কাছে আরও বড় হাতিয়ার হয়ে এল রক্তপরীক্ষা। রক্ত নিয়ে গবেষণার সূত্র ধরে বিজ্ঞানীরা ডিপথেরিয়া আর সাপের কামড়ের সিরাম যেমন আবিষ্কার করলেন, তেমনই সামান্য ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে অপরাধী ধরাও সোজা হয়ে গেল। প্রথম দিকে রক্ত পরীক্ষা করে ধরা যেত, রক্তটা কোনও জানোয়ারের, না মানুষের। ১৯০২ সালে এই রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে ফ্রান্সে এক খুনিকে গিলোটিনে পাঠানো সম্ভব হয়। খুনি যখন ধরা পড়ে তখন তার হাতে-পায়ে রক্ত লেগে ছিল। তার দাবি, খরগোশের রক্ত। পরীক্ষা করে দেখা গেল, মানুষের রক্ত। এই প্রমাণের সূত্র ধরে খুনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল।

**অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে ধরার ক্ষেত্রে বাস্তবে যিনি আঙুলের ছাপ প্রথম কাজে লাগালেন, তিনি স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন। ১৮৯২ সালে তাঁর বই বের হল। 'ফিঙ্গার প্রিন্টস'। সেই বইতে তিনি নমুনা তুলে দেখালেন, দুটো আঙুলের ছাপ কখনই এক রকম হয় না। ওই বছরেই আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে পুলিশ অপরাধী ধরল।**

১৯১০ সালে ব্রিটেনে এক খুনের মামলায় রক্তের নমুনা প্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ইসাবেলা উইলসন নামে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে তাঁর পুরানো জিনিস কেনাবেচার দোকানে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। দোকানই ছিল ইসাবেলার থাকার ঠিকানা। দেহটা পড়ে ছিল দোকানঘরের পিছনের উঠোনে। নৃশংস ভাবে তাঁকে থেঁতলানো হয়েছে, কোপানো হয়েছে। তাতেও না-মরায় গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটা ঘটে ইংল্যান্ডের স্লো-তে। দরিদ্র ইসাবেলার দোকানের অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু জায়গার

মালকিন তিনিই। উইলিয়াম ব্রুম নামে একটা লোকের জায়গাটার উপর নজর ছিল। তাকেই পুলিশ বেশি সন্দেহ করল। ইসাবেলার মৃত্যুর দিন উইলিয়াম ব্রুম স্লো থেকে উধাও হয়ে যায়। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ উইলিয়াম ব্রুমকে নর্থ লন্ডনের হার্লেসডেনে পেল। সেখানে সে এক পতিতার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। পতিতাই উইলিয়ামের হয়ে অ্যালিবাই দিল। পুলিশকে বলল, যে দিন ইসাবেলা খুন হয়েছেন সেদিন উইলিয়াম ব্রুম তার সঙ্গেই ছিল। পুলিশ দেখল, উইলিয়াম ব্রুমের মুখে আঁচড়ের দাগ। জিজ্ঞাসা করায় পতিতা হাসল। বোঝাতে চাইল, অভিসারের ফল। কিন্তু, ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞের হাত থেকে উইলিয়াম ব্রুম রক্ষা পেল না। হোম অফিসে রক্তপরীক্ষার প্রধান বিশেষজ্ঞ ডাঃ উইলিয়াম উইলকক্স মৃতার হাতের আঙুলে নখের তলায় রক্তের চিহ্ন খুঁজে পেলেন। সেই নমুনার সঙ্গে উইলিয়াম ব্রুমের মুখের আঁচড় মিলিয়ে দেখা হল। ক্ষতর রক্তের সঙ্গে ইসাবেলার নখের তলার রক্তের নমুনা মিলে গেল। উইলিয়াম ব্রুম ফাঁসিতে চড়ল।

কুড়ি বছরের মধ্যেই অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ডঃ কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার আমেরিকার ল্যাবে ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করে ফেললেন। ১৯৩০ সালে নোবেল প্রাইজও পেলেন। তাঁর এই আবিষ্কার চিকিৎসকদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। সেই আশীর্বাদ পুলিশের গোয়েন্দারাও পেলেন। ল্যান্ডস্টেইনারের ওএবি সিস্টেম মানুষের রক্তকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলল। টাইপ ও, টাইপ এ, টাইপ বি ব্লাড গ্রুপ। সেই গ্রুপ মিলিয়ে অপরাধী শনাক্ত করা আরও সহজ হয়ে গেল।

৩

রক্তের দাগ পাওয়া গেলে ভাল, কিন্তু না-পাওয়া গেলে? সেক্ষেত্রে পুলিশকে সাহায্য করেছিলেন ফরাসি অপরাধতত্ত্ববিদ আলেসান্দ্রে লাকাসেইন (Alexandre Lacassagne)। পুলিশ খুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাল। গিয়ে দেখল, রক্তের দাগ এক জায়গায়, লাশ আর এক জায়গায়। তখন তারা কী করে বুঝবে খুনটা ঠিক কোথায় হয়েছে? অকুস্থলে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে অথচ বডিটা সেখানে নেই। বডি পড়ে আছে অন্য জায়গায়। তখন পুলিশ কী করে বুঝবে আততায়ী কোথায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে? খুনের সময় নিহত ব্যক্তি কোনখানে থাকতে পারেন, লাকাসেইন তা দেখিয়ে দিলেন।

ধরা যাক, কোনও পেপারওয়েটের মত বস্তু দিয়ে আততায়ী মেরেছে। রক্তের ফোঁটা সেই জিনিস থেকে সোজা মাটিতে পড়লে একটা খাঁজকাটা গোলাকার দাগ দেখা যাবে। মাটি থেকে খুনের অস্ত্রটির ব্যবধান যত বেশি হবে, রক্তের ফোঁটা তত ছড়িয়ে পড়বে। আততায়ী আঘাত করল। আক্রান্তের শরীর থেকে প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ল। আক্রান্ত পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল। কিংবা, খুনি সেখান থেকে তাকে টেনে হিঁচড়ে সরাল। আক্রান্ত যেদিকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে কিংবা লাশ যেদিকে সরানোর চেষ্টা হয়েছে রক্তের দাগটা তখন সেদিকে একটা বিস্ময়কর চিহ্নের আকার নেবে।

একটি খুনের ঘটনার পর, প্রফেসর লাকাসেইনের এই তত্ত্বের সহায়তায় পুলিশ বাহিনী অকুস্থলে গিয়ে গোয়েন্দাদের জন্য চার্ট তৈরি করে ফেলল। নিহতকে কোন স্থানে প্রথম আঘাত করা হয় এবং তার পর থেকে কী কী ঘটেছিল, প্রফেসর লাকাসেইনের সূত্র ধরে পুলিশ গোটা ক্রাইম সিন সাজিয়ে তুলল। রক্তের নমুনা ছাড়াই অপরাধী ধরা পড়ে গেল।

১৯৫০ সালের ২৯ জুলাই ৪৩ বছরের ক্যাথরিন ম্যাকক্লাসকিকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় রাস্তার মাঝখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, মহিলার দেহটি কোনও মোটরকার বা লরি টানতে টানতে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে টানা রক্তের দাগ।

কেসটা গেল প্যাথোলজিস্ট প্রফেসর অ্যান্ড্রু অ্যালিসনের হাতে। তিনি লাশ পরীক্ষা করলেন। রিপোর্ট দিলেন, কোনও ড্রাইভার ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেলে যে ধরনের ক্ষত হয় সেই ধরনের ক্ষত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যালিসনের মতে, হয় ক্যাথরিনকে কেউ থেঁতলে মেরে, তার পর তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছে এটা অ্যাক্সিডেন্ট, নয়তো তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ির চাকায় পিষে মারা হয়েছে।

পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখল, ক্যাথরিন ম্যাকক্লাসকির একাধিক বয়ফ্রেন্ড ছিল। তাদের সবাইকেই পুলিশ খুঁজে বের করল, জিজ্ঞাসাবাদ করল। তাদের মধ্যে একজন পুলিশও ছিল। জেমস রবার্টসন।

জেমস রবার্টসনকেই পুলিশ বেশি সন্দেহ করল। পুলিশ রবার্টসনের ঘরদোর সার্চ করল। প্রচুর চোরাই মাল পাওয়া গেল। বোঝা গেল, রবার্টসন অসৎ। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, সে ক্যাথরিনকে জেনে বুঝে খুন করেছে।

তবু জেরা চলতে থাকল। জেরার মুখে রবার্টসন ভেঙে পড়ল। বলল, ক্যাথরিনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সময় অ্যাক্সিডেন্টালি এই ঘটনা ঘটেছে। বুঝতে পারে নি, ক্যাথরিন গাড়ির তলায় ঠিক কোনখানটায় আটকে পড়েছে। সে গাড়িটা আগুপিছু করে ক্যাথরিনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। যখন তাতে লাভ হল না তখন সে তাকে গাড়ির তলা থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্যাথরিন তখন বেহুঁশ, রক্তে ভাসছে। ভয় পেয়ে সে গাড়ি নিয়ে পালায়।

পুলিশ কিন্তু রবার্টসনের একটা কথাও বিশ্বাস করে নি। কারণ, নিহতের পায়ে কোনও টায়ারের দাগ বা ক্ষতচিহ্ন ছিল না। প্রফেসর জন গ্লেইসটার ছিলেন লাকাসেইন মেথডে সিদ্ধহস্ত। তিনি বললেন, রবার্টসন যদি ক্যাথরিনকে গাড়ির তলা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে, তাহলে তার ট্রাউজারে রক্তের দাগ নেই কেন? রক্তে ভেসে যাওয়া কোনও মানুষকে গাড়ির তলা থেকে টেনে বের করতে গেলে তো যে কারও জামাকাপড়ে অনেক রক্ত লেগে থাকার কথা। রবার্টসনের প্যান্টে ছিটেফোঁটা রক্তও লাগেনি। রবার্টসনের 'স্বীকারোক্তি' ধোপে টিঁকল না। প্ল্যানমাফিক ক্যাথরিনকে বীভৎস ভাবে খুনের অপরাধে জেমস রবার্টসনের ফাঁসি হল।

ক্যাথরিনের রক্তই খুনিকে ধরিয়ে দিল। যদিও খুনির হাতে-পায়ে, জামা-কাপড়ে রক্তের কোনও দাগই ছিল না।

৪

হত্যাকারীকে ধরার নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পুলিশের হাতে যত আসতে থাকল, মানুষ খুনেরও নতুন নতুন পন্থা বেরিয়ে গেল। আমেরিকায় পুলিশের হাতে অপরাধীদের সব থেকে বেশি ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। ১৯৯৫ সালের হিসাবে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) হাতে ২ কোটিরও বেশি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল। অন্যান্য ল' এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি চাইলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা তা পেয়ে যেত। প্রতিদিন তাদের কাছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য অন্ততপক্ষে ৩০ হাজার এনকোয়ারি আসত। লেসার বিম কাজে লাগিয়ে সেকেন্ডে ৮০টি আঙুলের ছাপ

**অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ডঃ কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার আমেরিকার ল্যাবে ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করে ফেললেন। ১৯৩০ সালে নোবেল প্রাইজও পেলেন। তাঁর এই আবিষ্কার চিকিৎসকদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। সেই আশীর্বাদ পুলিশের গোয়েন্দারাও পেলেন। ল্যান্ডস্টেইনারের ওএবি সিস্টেম মানুষের রক্তকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলল। টাইপ ও, টাইপ এ, টাইপ বি ব্লাড গ্রুপ। সেই গ্রুপ মিলিয়ে অপরাধী শনাক্ত করা আরও সহজ হয়ে গেল।**

মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এফবিআইয়ের ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ছিল। এখন হয়ত আঙুলের ছাপ মেলানোর ব্যাপারে এফবিআই আরও দ্রুত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। তা সত্ত্বেও আঙুলের ছাপ মিলিয়ে মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ অপরাধী আমেরিকায় ধরা পড়ে।

খুনের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকল তখন পুলিশের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট চিন্তায় পড়ে গেল। কোনটা প্ল্যানমাফিক, আর কোনটা অ্যাকসিডেন্ট বুঝতে

অসুবিধা হচ্ছে। আমেরিকায় তখন কোল্ট রিভলভার সাধারণের হাতে। একটু পয়সা থাকলেই যে কেউ কিনতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্র ফোরেনসিক ল্যাবরেটরি এক্সপার্টদের কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন। ১৯১২ সালের মে মাসে, প্যারিসে কংগ্রেস অফ লিগ্যাল মেডিসিনে ব্যালিস্টিকস ফোরেনসিক সায়েন্সের নতুন শাখা হিসাবে গ্রাহ্য হল।

ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের মতই ব্যালিস্টিকস খুনি ধরে দিতে সাহায্য করে। আঙুলের ছাপের মত প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রেরই একটি নিজস্বতা আছে। গুলি কোন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বেরিয়েছে, ব্যালিস্টিকস পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। ব্যালিস্টিকসের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশের প্রথম কাজ খুনের আগ্নেয়াস্ত্রটা খুঁজে বের করা। অপরাধী ধরার কাজ তাতে অনেকখানি এগিয়ে যায়।

১৯১২ সালের প্যারিস সম্মেলনে প্রফেসর ভিক্টর বালথাজার্ড প্রতিনিধিদের একটি কেসের কথা বলেন। গিলোটিন নামে এক ব্যক্তি গুলিতে নিহত হন। সুরতহালের পর গিলোটিনের শরীরে বেশ কয়েকটা বুলেট পাওয়া গেল। খুনের জন্য পুলিশ যাকে সব চাইতে বেশি সন্দেহ করছিল তার নাম হুজার্ড। হুজার্ডকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিল। তার আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করল। দক্ষিণ ফ্রান্সের আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞরা দেখে বুঝতে পারলেন না, গুলিগুলো হুজার্ডের আগ্নেয়াস্ত্রের কি না। পুলিশের কর্তারা প্যারিসের নামজাদা ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞ বালথাজার্ডের শরণাপন্ন হলেন। বালথাজার্ড হুজার্ডের আগ্নেয়াস্ত্রটি পরীক্ষা করলেন। তিনি তুলনা করে দেখিয়ে দিলেন, বুলেটগুলোর গায়ে যে দাগ তার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রটির নলের ভিতরকার দাগের অন্তত ৮৬টি মিল রয়েছে। হুজার্ড গিলোটিনে গেল। ছোঁড়া গুলি আর আগ্নেয়াস্ত্রের যে ধাতব নলের ভিতর থেকে গুলি বেরিয়েছে, সেই মেটাল টিউব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার বালথাজার্ড মেথড ব্যালিস্টিক সায়েন্সের ভিত্তি স্থাপন করল।

ব্যালিস্টিক সায়েন্সকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন আমেরিকান চার্লস ওয়েট। চার্লস ওয়েট ছিলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট পুলিশ কাছারির এক্সপার্ট। প্রায় সারা জীবন তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েই গবেষণা ও তদন্তে কাটিয়ে ছিলেন। গুলিতে হত্যার একটি কেসের সূত্র ধরে তিনি প্রথম তদন্তে নামেন। ওয়েটের তদন্তে দেখা গেল, যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলিটি বেরিয়েছে সেই আগ্নেয়াস্ত্রটি অভিযুক্তের নয়। অভিযুক্তের আগ্নেয়াস্ত্র আর নিহতের শরীরে পাওয়া বুলেটের আগ্নেয়াস্ত্র এ-ক নয়। ওয়েটের গবেষণার রিপোর্ট এক নিরপরাধের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

টানা ১০ বছর ধরে আমেরিকার অস্ত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিটি টাইপ এবং সেই আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোঁড়া বুলেটের নমুনা জোগাড় করেন এবং সযত্নে সেই নমুনাগুলির ক্যাটালগিং করেন। এর পর ইউরোপের আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে অস্ত্র আনিয়ে সেগুলিরও ক্যাটালগিং করেন ওয়েট। নতুন সিস্টেমকে আরও পরিশীলিত করতে তিনি বশ অ্যান্ড লম্ব (Bausch & Lomb) অপটিকাল কোম্পানিকে বললেন, তাঁকে নতুন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে দিতে। বুলেট পরীক্ষা করার জন্য ওয়েটের নতুন মাইক্রোস্কোপের দরকার ছিল। এর পর ফিলিপ গ্রাভেল নামে এক বিশেষজ্ঞ 'কমপ্যারিজন মাইক্রোস্কোপ' বা 'তুলনা করার অনুবীক্ষণ' তৈরি করলেন। টেস্ট বুলেটের পাশে খুনের বুলেট রেখে চট করে যাতে পরীক্ষা করা যায়, সেই জন্য এই ধরনের মাইক্রোস্কোপের দরকার ছিল।

ব্যালিস্টিক বিজ্ঞানের গবেষণা আরও এগোল। জন এইচ ফিশার নামে এক পদার্থবিজ্ঞানী হেলিক্সোমিটার নামে একটি যন্ত্র বানালেন। একটা সরু, আলো লাগানো তার, যা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের নলের ভিতরটা পরীক্ষা করা যায়। ব্যালিস্টিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন যন্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওয়েট এবং তাঁর বন্ধু, অবসরপ্রাপ্ত আর্মি ডাক্তার ক্যালভিন গডার্ড ১৯২৩ সালে নিউ ইয়র্কে ব্যুরো অফ ফোরেনসিক ব্যালিস্টিক্স প্রতিষ্ঠা করলেন।

ব্যালিস্টিক সায়েন্সে ওয়েট আর গডার্ডের বিস্ময়কর সাফল্য গোটা বিশ্বেই কাজে লেগেছিল। এমনকী, নাৎসি জার্মানিও তার সুযোগ নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি

জার্মান এসএস বাহিনী ইহুদিদের পাশাপাশি পোল্যান্ডের বাসিন্দা অর্থাৎ পোলদের গণনিধন করছিল। বহির্বিশ্বে সেই খবর পৌঁছালে হিটলার ও তার চ্যালাচামুণ্ডারা চাপে পড়ে যায়। গোপন ওই গণনিধনের খবর পেয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট যাতে সরাসরি জার্মানি আক্রমণের নির্দেশ না-দেন সেটা হিটলার গোয়েবলস-হিমলারদের খেয়াল রাখতে বলেছিল। ১৯৪৩ সালে হিটলার কোনও ভাবেই ইউরোপের পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ চাইছিল না। রাশিয়ায় অর্থাৎ পূর্ব ফ্রন্টে তখন যুদ্ধ পরিস্থিতি শোচনীয়।

এমন একটা সময়ে, আর এক নরাধম পাষণ্ড জোসেফ স্ট্যালিনের একটি কুকীর্তি হিটলারের তুরুপের তাস হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪০ সালে পশ্চিম রাশিয়ার স্মলেনস্কের কাছে কাতিন অরণ্যের ভিতরে পোল্যান্ডের ৪ হাজার কমিশনড সেনা অফিসারকে বেঁধে গুলি করে মারা হয়। তার পর তাঁদের চুনে-ভরা গর্তে একসঙ্গে কবর দেওয়া হয়। পোল অফিসারদের মধ্যে জেনারেল থেকে লেফটেন্যান্ট, সব স্তরের অফিসার ছিলেন। ১৯৪১ সালে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে। ১৯৪৩ সালে কাতিন অরণ্যের ভিতরে ফার গাছে ছাওয়া একটি জায়গায় জার্মান বাহিনী সেই গণকবর খুঁজে পায়। জার্মানির প্রচার মাধ্যমে ঘোষিত হল স্ট্যালিনের গুপ্ত পুলিশ এনকেভিডি পোল সেনা অফিসারদের হত্যা করেছে। নিহতদের প্রত্যেকের গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে সেই দড়ি দিয়ে হাত দুটো বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এমন গিঁট, টানাটানি করলে দড়ির ফাঁস আরও শক্ত হয়ে চেপে বসবে। প্রত্যেক অফিসারের মাথায় একটা করে গুলি করা হয়েছিল।

পরে জানা যায়, ১৯৪০ সালে নয়, কাতিন অরণ্যের এই গণহত্যা শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সালের তেসরা এপ্রিল। শেষ হয় পাঁচ সপ্তাহ বাদে, ১৩ মে। পাঁচ সপ্তাহ ধরে বন্দিদের তিন ভাগে কোজেলস্ক, স্টারোবেলস্ক এবং ওসতাশকভের শিবিরে রাখা হয়েছিল। তার পর ৫০ থেকে ৫০০-র দল বানিয়ে গোরুর মত দফায় দফায় ট্রেনে করে অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় যেমন ঘোড়ায় টানা ওয়াগনে চাপিয়ে গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হত, ঠিক সেভাবেই রেলপথে ক্যাটল ওয়াগনে চাপিয়ে কোরেলস্ক শিবিরের বন্দি ৪ হাজার ৪০০ পোল অফিসারকে কাতিন অরণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠাণ্ডা মাথায় হাত বেঁধে গুলি করে মারা হয়।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় কাতিন অরণ্যের পোল গণকবর নতুন করে খোঁড়া হল। জার্মানির এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোরেনসিক মেডিসিনের প্রফেসর গেরহার্ড বুটজকে লাশ তুলে পরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হল। দশ সপ্তাহ ধরে বাতাসে পচা লাশ আর ইজিপ্সিয়ান টোব্যাকোর গন্ধ ভেসে বেড়াল। পচা মাংসের গন্ধ ঢাকার জন্য জার্মান অফিসাররা ইজিপ্সিয়ান চুরুট খেতেন। লাশগুলো

**ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের মতই ব্যালিস্টিকস খুনি ধরে দিতে সাহায্য করে। আঙুলের ছাপের মত প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রেরই একটি নিজস্বতা আছে। গুলি কোন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বেরিয়েছে, ব্যালিস্টিকস পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। ব্যালিস্টিকসের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশের প্রথম কাজ খুনের আগ্নেয়াস্ত্রটা খুঁজে বের করা। অপরাধী ধরার কাজ তাতে অনেকখানি এগিয়ে যায়।**

যখন কবর থেকে তুলে আনা হল তখন সেই সব শবের গন্ধের সঙ্গে মস আর পাইনের আঠার গন্ধ মিশে একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হল।

কাতিনের ঘটনার তদন্তে জার্মানরা তিনটি কমিশন বসাল। একটা জার্মান কমিশন, একটা অধিকৃত বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং 'নিরপেক্ষ' সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী ও ফোরেনসিক এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশন। আর একটি অধিকৃত পোল্যান্ডের কমিশন।

যা এভিডেন্স পাওয়া গেল, সবই জার্মানির মতামতের পক্ষে গেল। নিহতদের শরীরে যে বুলেট

পাওয়া গিয়েছিল, সবই জার্মান বুলেট। বুলেট তৈরির কারখানার খাতা দেখে জানা গেল, যুদ্ধ শুরুর আগে ওই ব্যাচের বুলেট সবই বালটিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়াকে হিটলারের জার্মানি বিক্রি করেছিল। তিন বালটিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া আর এস্তোনিয়া জোসেফ স্ট্যালিন গ্রাস করার পর সোভিয়েত রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশ বাহিনী এনকেভিডি সেইসব বুলেট বাজেয়াপ্ত করে। ওয়েট যে ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র আর বুলেট নিয়ে পরীক্ষা করতেন ঠিক সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বুটজ বুলেটগুলি টেস্ট করলেন। রিপোর্ট দিলেন,

**কাতিনের ঘটনার তদন্তে জার্মানরা তিনটি কমিশন বসাল। একটা জার্মান কমিশন, একটা অধিকৃত বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং 'নিরপেক্ষ' সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী ও ফোরেনসিক এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশন। আর একটি অধিকৃত পোল্যান্ডের কমিশন। যা এভিডেন্স পাওয়া গেল, সবই জার্মানির মতামতের পক্ষে গেল। নিহতদের শরীরে যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সবই জার্মান বুলেট।**

সোভিয়েত রাশিয়াই ৪ হাজারেরও বেশি পোল সেনা অফিসারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কাতিনের ঘটনা কারা ঘটিয়েছিল তা নিয়ে প্রায় পাঁচ দশক ধরে বিতর্ক চলে। জার্মানি বলেছে, রাশিয়ানরা ঘটিয়েছে। রাশিয়ানরা দায়ী করেছে জার্মানদের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রাশিয়ানদেরই অপরাধী বলে দেখিয়ে দিয়েছে।

ডিক্টেটর হিসাবে স্ট্যালিন চাইলে দিনকে রাত করতে পারতেন। তাঁর গুপ্ত পুলিশ বাহিনী দুই মিনিটের মধ্যে যে কাউকে ভ্যানিশ করে দিতে পারত। কিন্তু তর্কাতীত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ লোপাট করার সাধ্য তাঁর ছিল না।

যুদ্ধ শেষের পর দেখা গেল, পোল্যান্ড সহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একই জিনিস ঘটিয়েছে হিটলারের এসএস বাহিনীও। হাজার হাজার ইহুদি, পোল, রাশিয়ান, চেক, রুমানিয়ানকে খতম করেছে 'ফাইনাল সলিউশনে'র নামে। ট্রেবলিঙ্কা, বিরকেনাউ, সবিবরের মত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দিদের দিয়ে বিশাল বিশাল গণকবর কাটিয়ে প্রত্যেককে হাঁটু গেড়ে বসিয়েছে। মাথায় মাউজার ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। গর্তে পড়ে যাওয়ার পর মৃতদের মাটি চাপা দিয়েছে। ন্যুরেমবার্গ বিচারের সময় সেসব রিপোর্ট বিচারপতিদের টেবিলে জমা পড়েছিল।

কড়াকড়ি সত্ত্বেও আমেরিকায় এখনও ৭ কোটি ৫০ লক্ষের উপর আগ্নেয়াস্ত্র লোকের হাতে রয়েছে। সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিন গুলি খেয়ে সেখানে মারা যায় ৬৩ জন। সম্প্রতি সংখ্যাটা বেড়েছে। পুলিশকে যখন তখন যে কেউ মারছে, আবার আতঙ্কে পুলিশও ট্রিগার হ্যাপি। পুলিশের গুলির শিকার হচ্ছে মূলত কৃষ্ণাঙ্গরা। ব্রিটেন সহ ইউরোপে গুলিতে নিহত হওয়ার সংখ্যাটা কিন্তু নিতান্তই কম। আমেরিকায় তাই ব্যালিস্টিক সায়েন্টিস্টদের সামনে এখনও চ্যালেঞ্জ সব থেকে বেশি।

প্রতিদিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) ব্যালিস্টিক ইউনিটের উপর চাপ বাড়ছে। যত নতুন ধরনের খুনের অস্ত্র তারা পাচ্ছে ততই তাদের সে ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। সেই ১৯৩০-এর দশক থেকে আমেরিকায় মাফিয়ারা নিত্যনতুন অস্ত্র নিজেরাই বানাচ্ছে। এছাড়া, বেসমেন্টে আগ্নেয়াস্ত্র বানিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার হবিও বহু লোকের আছে। ১৯৮০-র দশক থেকে সেদেশের এক বড় উৎপাত ড্রাগ মাফিয়ারা। আমেরিকার কালোবাজারে নতুন নতুন মেশিনগান আর পাম্প অ্যাকশন শটগান তাদেরই আনা। ব্যালিস্টিক এক্সপার্টদের কাছে সেগুলোর তথ্য অপরাধ দমনে আমেরিকার আইনরক্ষকদের অন্যান্য দেশের চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে রেখেছে।

*(এরপর আগামী সংখ্যায়)*

## আমচরিত কথা

# ভক্ত বা ভক্তি বিষয়ক

## তনুশ্রী পাল

রোজ স্নানান্তে আমাদের ছোটদাদুর পরিত্রাহি চিৎকার বা অতি উচ্চকণ্ঠের সূর্যপ্রণাম মন্ত্র পাড়াসুদ্ধ সবাই শুনতে পেত। সম্পর্কে তিনি আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন। ভেজা গায়ে, ভেজা লালরঙা গামছা মাত্র পরিধান করে জোড়হস্তে আকাশের দিকে চেয়ে অনেকটা সময় ধরে প্রার্থনা করতেন, 'ওম জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধান্তারিং'... ইত্যাদি শেষে 'জয় ব্রহ্মময়ী মা, জয় তারা, মা মা মাগো... জয় বাবা ভোলা মহেশ্বর... জয় জয় হে মা ব্রহ্মময়ী, রক্ষা কর রক্ষা কর রক্ষা কর হে ঠাকুর।' তাঁর অমন আকুল চিৎকার শুনে মনে হত সত্যি ভয়ংকর ঝড় ঝঞ্ঝা বন্যা ভূমিকম্প ধেয়ে আসছে বুঝি পৃথিবীর দিকে! বুঝি বা সাপ ব্যাঙ ভূত প্রেত দত্যি দানোরা ঘিরে ফেলেছে আমাদের পাড়াসুদ্ধ সব্বাইকে! সম্ভবত আত্মরক্ষার্থে নানান আকারের ও প্রকারের লাল কালো সুতোয় বাঁধা তাবিজ-কবচ, অজ্ঞাতনামা গাছের মূল বা শিকড়ের টুকরোও ছোটদাদুর হাতে গলায় সেঁটে থাকতে দেখেছি। তাঁর অস্থির চাউনি, ছটফটিয়ে পথে পথে বা এর তার বাড়ি ঘুরে বেড়ানো দেখে সবারই মনে হত কীসের যেন উৎকণ্ঠায় ভুগছেন! যেন রাজ্যের প্রচুর কাজ তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে আছে কোথাও! সে যাইহোক, ছোটদাদুর একান্ত দৈবনির্ভরতা এবং দেবদেবীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি বিষয়ে গ্রামসুদ্ধ, পাড়াসুদ্ধ লোকের কোনও সন্দেহই ছিল না।

পেশায় শিক্ষক ছোটদাদুর স্কুলটি ছিল বলতে গেলে বাড়ির একেবারে পাশটিতেই। তবু রোজই স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত তাঁর, অকারণেই। হাওয়াই চপ্পলে কেমন কচাত কচাত শব্দ তুলে দ্রুত হাঁটতেন। কালো কুচকুচে ঢেউ তোলা চুলে জবাকুসুম তেল মেখে, জোড়া ভুরুতে বিরক্তির স্পষ্ট ভাঁজ তুলে, মহা গম্ভীর মুখে শন শন করে প্রায়ই স্কুলে গিয়ে হাজির হতেন প্রথম ঘণ্টা পড়ে যাওয়ার পরে। তাঁর এই দেরি হওয়াটা শুরু হত স্নানের পায়তারা কষতে গিয়েই। কুয়োতলায় বালতি বালতি জল মাথায় ঢালবার আগে থেকেই নানান কসরৎ চলত; প্রথমত হাতের তেলোয় সর্ষের তেল নিয়ে জয় মা তারা, জয় মা কালী বলে ডাকাডাকি। তারপর সেই তেল গায়ে হাতে পায়ে কানে নাকে নখে পালিশ করে চটি ফটফটিয়ে সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে একেবারে পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠতেন। রাস্তার এমাথা ওমাথা কেন হাঁটাহাঁটি করতেন তা তিনিই জানতেন। পাড়া টহল দিয়ে ফিরে তবে স্নান, মন্ত্র, পোশাকপরা, খাওয়াদাওয়া ব্যাস এতেই সময় কাবার।

যাইহোক এবারে আসি ছোটদাদুর ভক্তি বিষয়ক কাহিনীতে, যা আপনাদের আজ শোনাব বলে মনস্থ করেছি। ছোটদাদুর দেব-দেবতায় ভক্তির সঙ্গে সাধু সন্ন্যাসীতেও অগাধ আস্থাও ছিল প্রবল!

শৈশবকাল থেকেই দেখেছি প্রতিবছর মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের শুরুতে একজন বিশেষ মানুষ আমাদের কাছে আসতেন। চিঠিতে আগমন সংবাদ জানাতেন কিন্তু চলে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। হঠাৎ করেই বিদায় নিতেন, তখন শত অনুরোধ উপরোধেও তাঁকে ধরে রাখা যেতনা। রক্তাম্বর পরিহিত, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টিপ, জটাজূটধারী সেই সন্ন্যাসীঠাকুরকে বাড়ির সবাই খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এসে তাঁর কাঁধের ঝোলা নামাতেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা সেই গদিঘরে। সেই ঝোলাতেই থাকত তাঁর যাবতীয় পূজার উপকরণ এবং সিন্দুরচর্চিত ছোট একটি ধাতব মাতৃমূর্তি।

বড় একটা চামড়ার আসনে বসে, উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে মহারাজজি পুজো করতেন, চণ্ডীপাঠ করতেন। টকটকে লালজবায় সাজাতেন মাতৃমূর্তি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীরটি পুজোর আসনে বসলেই মেরুদন্ড একেবারে টানটান! সত্যি সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! লালচে আভাযুক্ত বড়বড় জ্বলজ্বলে চোখদুটির দিকে তাকালে কেমন ভয় ভয় লাগত। পাড়াসুদ্ধ লোক তাঁকে মহারাজজি বলেই ডাকত। বাড়ির সকলেরই তাঁর প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি। শুনেছি আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহুকালের। ওপার বাংলার পাটগ্রামের পাটেশ্বরী কালীবাড়ির পূজারী ছিলেন মহারাজজি। তিনি স্বপাকে খেতেন। ভোগ রান্না করে দেবীকে নিবেদন শেষে সবাইকে প্রসাদ দিতেন তারপর নিজে খুব সামান্যই মুখে তুলতেন। সে ভোগের প্রসাদের কী অপূর্ব গন্ধ, স্বাদ! ধূপের ধোঁয়া, প্রদীপের আলো, এত এত ফুলের মেলা, চন্দনের মৃদু গন্ধ সবমিলিয়ে অপূর্ব প্রশান্তি আর অপরূপ আনন্দে চারদিক যেন ভরে থাকত।

তা তিনি এলেই আমাদের সে ছোটদাদু স্বঘোষিত প্রধান চ্যালা হয়ে প্রায় সময়েই মহারাজজির সঙ্গে একেবারে লেপ্টে থাকতেন। নানাভাবে সেবাযত্ন করার চেষ্টা করতেন। ছোটদাদুর নাম ছিল নরেন, মহারাজজি দাদুকে ডাকতেন 'লরেন' বলে। প্রসাদ বিতরণ থেকে শুরু করে অন্যান্য পূজার উপকরণ এগিয়ে দেওয়া, প্রসাদী ফুল উপস্থিত সবার হাতে দেওয়া সবই তিনি একা করতেন। ইচ্ছুক কাউকেই সুযোগ দিতেন না মোটে। এমনকী নিজের স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রটিকেও নয়। বাকিদের ঘরদোর ধুয়েমুছে, ঠাকুরের বাসন মেজে, পুজোর ফুল বেলপাতা দুর্বা ইত্যাদি জোগাড় করেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। যাইহোক একসময় শারীরিক কারণেই অশীতিপর মহারাজজির পরিক্রমা বন্ধ হল। এর বেশ কিছুদিন পরে একটি পোস্টকার্ডে খবর এল বিহারের মধুবনি জেলায় নিজের বাড়িতেই এই মাতৃসাধক পরলোকগমন করেছেন। পাড়াসুদ্ধ সবাই শোকার্ত হয়ে পড়লেন। আমাদের বাড়িতে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল মহারাজজির উপস্থিতি, পূজাপাঠে গৃহের দুর্বিপাক কেটে যায়। ঠাকুমা খুবই হাহুতাশ করতে লাগলেন, যেন প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক হারালাম আমরা। ছোটদাদু ঘনঘন 'তারা তারা ব্রহ্মময়ী' ডাক ছাড়লেন কয়েকদিন, তারপর সময় বা কাল তো ত্রিতাপহারিণী! তবে

ছোটদাদুর সন্ন্যাসীপ্রীতি বা ভক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরপর নানা ঘটনায়। আর সবাই যে প্রকৃত সিদ্ধ সাধক বা শুধুই মানুষের মঙ্গলকামী নন তারও প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল।

গোটা ছয়েক শিষ্য সমেত এক মাতাজির আবির্ভাব হল গাঁয়ে। লালপাড় সাদা শাড়ি, মাথায় জটা, কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল, মুখে মৃদু হাসি। গোলগাল চেহারা। শিষ্যদের হাতেও চিমটা, কমন্ডলু, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, পিঠে ঝোলাঝুলি। মানুষের কপাল দেখে মাতাজি নাকি ভূত ভবিষ্যত সবই বলতে পারেন। পরীক্ষার রেজাল্ট, প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। বিশেষ যাগযজ্ঞ করে একদম যেমনটি চাইবে, যা চাইবে বা যাকে চাইবে সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দিতে পারেন মাতাজি। আসাম না বিহার কোথা থেকে যে এলেন সে আমার মনে নেই। সেখানে পাঁচটি ফল, পাঁচ কেজি চাল বা পাঁচ রকমের শস্য, সোনা রূপা তামা ইত্যাদি পাঁচ প্রকারের ধাতু এইসব দিয়ে প্রণাম করতে হয়। মানে যা দেবে সবেতেই পাঁচ থাকা চাই। টাকা দিলেও তাতে পাঁচ সংখ্যাটি থাকা চাই। কিপ্টের মত দান করলে ফলও পাবে ওই বিন্দুমাত্র। হাত খুলে, মনে ভক্তি নিয়ে দানধ্যান করলে ভবিষ্যতে ফললাভ করবে। যা তুমি দেবে সবই পাঁচগুণ হয়ে ফিরে আসবে তোমারই ঘরে। প্রথমে স্টেশনের লিচুতলায় এসে ডেরা বাঁধলেন তারা। শুধু ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধারণ মানুষেরাই নন, ভোরে বা সন্ধের আবছায়ায় ছাত্রছাত্রী বা প্রেমিক প্রেমিকারাও মাতাজির ডেরায় হাজির হতে লাগল। গ্রামের লোকের আগ্রহে ক'দিনের মধ্যেই সশিষ্য মাতাজি কালীবাড়ির বারান্দায় অধিষ্ঠিত হলেন। রেজাল্টের চিন্তায় যথেষ্ট চিন্তিত আমিও সেখানে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে প্রেমঘটিত সমস্যায় জর্জরিত বন্ধু ফুল্লরা কার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করে একসন্ধ্যায় আমায় সঙ্গী নিয়ে সেখানে হাজির হল। তার প্রেমিকটি ইদানিং সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। যাইহোক সেখানে পৌঁছে আবছা অন্ধকারে কারও মুখই তত স্পষ্ট নয়, ধোঁয়া ধোঁয়া আর কেমন এক কটুগন্ধ! হাঁটু গেড়ে জোড়হস্তে আমরা মাতাজির সামনে বসি, ফুল্লরার চোখে জল। এক চ্যালা দশ টাকার নোট পাঁচটি মাতাজির পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নেয়। লাল টকটকে চোখের দৃষ্টি ফুল্লরার কপালে ন্যস্ত করে মাতাজি কেমন দুলে দুলে হাসেন! তারপর বলেন 'হাঁ আধা ফল হোবে। ভালবাসা করবে কিন্তু বিয়া... হোবে না। নাঃ বিয়া হোবে না। পুরা ফল পাইতে গেলে পুরাপুরি আইসতে হোবে। এখন ভাগ ইখান থেকে। যাঃ যাঃ।' ফুল্লরা বেচারা ফুঁপিয়ে ওঠে। আর আমি যে এতক্ষণ জোড়হস্তে নীলডাউন হয়ে রইলাম তাতে কোনও লাভই হল না। বিনা পয়সার ভক্তের প্রতি তিনি দৃকপাতই করলেন না। অগত্যা ভগ্নমনোরথ দুই দুখিনী গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

মাতাজির এহেন আচরণ আমার মোটেই ভাল ঠেকল না, বড্ড নিষ্ঠুর মনে হতে লাগল। যাইহোক অভিযানটি গোপনেই রাখি আমরা। কিন্তু পাশের ছোটদাদুর বাড়িতে ধুন্দুমার লেগে গেল সেই রাতে; ছোটদাদুর স্ত্রীর হৈচৈ কান্নাকাটি শুনে পাড়াপ্রতিবেশী

**একসময় শারীরিক কারণেই অশীতিপর মহারাজজির পরিক্রমা বন্ধ হল। এর বেশ কিছুদিন পরে একটি পোস্টকার্ডে খবর এল বিহারের মধুবনি জেলায় নিজের বাড়িতেই এই মাতৃসাধক পরলোকগমন করেছেন। পাড়াসুদ্ধ সবাই শোকার্ত হয়ে পড়লেন। ছোটদাদু ঘনঘন 'তারা তারা ব্রহ্মময়ী' ডাক ছাড়লেন কয়েকদিন, তারপর সময় বা কাল তো ত্রিতাপহারিণী!** **তবে ছোটদাদুর সন্ন্যাসীপ্রীতি বা ভক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরপর নানা ঘটনায়। আর সবাই যে প্রকৃত সিদ্ধ সাধক বা শুধুই মানুষের মঙ্গলকামী নন তারও প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল।**

সবাই দৌড়ে গেলাম। জানা গেল মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে ছোটদাদু ইতিমধ্যে সেই মাতাজির ডেরায় একশো পাঁচ টাকা, ডালি ভরে পাঁচ প্রকারের ফল, চাল আটা সহ পাঁচ প্রকার শস্য প্রণামী দিয়েছেন এবং এখন পাঁচ প্রকার ধাতু দানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কাঁসা পেতল তামার থালা বাটি, রূপার বেলপাতা ইত্যাদি জোগাড় হয়েছে এখন ছোটদিদির কানের সোনার ফুলটি চাইছেন, চাওয়া মানে সে দিতেই হবে, দাবি। মহা গণ্ডগোল লেগেছে, মা বাবার ঝগড়া দেখে তাদের ছেলেটিও কান্নাকাটি জুড়েছে। বড়রা বিচারে বসেন, ছোটদাদুকে নিরস্ত করা হল। সত্যিই সেকালে একজন প্রাথমিক শিক্ষকের মাইনেতে এধরনের ব্যয়সাধ্য ভক্তিসাধনা বিলাসিতা ছাড়া আর কী? এরপর গ্রামের অন্যান্য বাড়ি থেকেও মাতাজি আর তার চ্যালাদের নিয়ে একটা অসন্তোষ ঘনীভূত হতে লাগল! দিন দশেক বাদে এক সকালে হঠাৎ দেখা গেল চ্যালাচামুন্ডা ও বোঁচকাবুচকিসহ সেই মাতাজি উধাও হয়ে গেছেন! ধুনির ছাই, কাঠকুটো, শুকনো জবা গাঁদা বেলপাতামাত্র পড়ে আছে এধারে ওধারে! ছোটদাদুও বিষণ্ণমুখে ক'দিন সেই পরিত্যক্ত ডেরার ধারে গিয়ে কেন যে বসে রইলেন! এযাত্রায় তার মোক্ষলাভ না হলেও ছোটদিদি পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে বলে বেড়ালেন যে, মাতাজি বিদায় হওয়াতে তিনি খুব শান্তি পেয়েছেন।

শান্তি পাওয়া কি আর মুখের কথা, চাইলেই পাওয়া যায়? মোক্ষলাভেচ্ছু মানুষের জীবন অত সহজ তো হতে পারে না। তা বছরখানেক পরে এক বাড়িতে বিশালদেহী এক গুরুদেব আবির্ভূত হলেন। কণ্ঠে তুলসির মালা, বিরাট ভুঁড়ি, সাদা ফতুয়া আর ধুতি, কপালে তিলক। পাঁচ প্রকার ভাজা, ফুল, অন্ন, নানা পদের তরকারি, চাটনি, মিষ্টান্ন আহার করেন। থালায় যা পড়ে থাকে শিষ্যরা প্রসাদ মনে করে সে উচ্ছিষ্ট খায়। তিনি এসেছেন সুদূর বৃন্দাবন থেকে, তিনি মধুর হেসে বলেন, সেখানে কুঞ্জবনে এখনও শ্রীরাধার নূপুর ধ্বনি শোনা যায়। যমুনায় নৌকা ভাসিয়ে জ্যোৎস্না রাতে রাধাকৃষ্ণ লীলা করেন। এমন সব মধুর কাহিনী শোনান গোঁসাইজি। তাঁর একটি মন্দির আছে যমুনার ধারেই। মন্দিরের সিঁড়ি নেমে গেছে যমুনার জলে। সিঁড়ির ধাপে একমনে একধ্যানে বসে থাকলে ভাগ্যবান ও পুণ্যবান মানুষেরা অলৌকিক বহু দৃশ্যই দর্শন করে জীবন ধন্য করতে পারেন। গোঁসাইজি আরও বলেন, তিনি এখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রকৃত ভক্ত শিষ্যের সন্ধানে। কারণ তাঁর বয়স হয়েছে, পৃথিবীর লীলা সংবরণের সময় হয়ে আসছে। প্রকৃত শিষ্য বা শিষ্যার হাতেই সে মন্দিরের ভার দিয়ে এখন তিনি চিরতরে চোখ বুজতে চান।

ওমা! ছোটদাদু প্রিয় ও প্রকৃত ভক্ত প্রমাণ দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে স্কুলটুল বন্ধ করে গোঁসাইজির কাছে পড়ে রইলেন এবং সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে সে মন্দিরের ভার নেওয়ার জন্যে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেখা গেল গোঁসাইয়ের আবার মহিলা ভক্তদের ওপর আস্থা বা প্রীতি খুবই বেশি। তিনি কমবয়সী বা অবিবাহিতা কন্যাদের ললিতা বিশাখা ইত্যাদি নামে ডাকতে লাগলেন। ছোটদাদুকে কাপড় চোপড় কাচতে দেন, পেটখারাপের রুগী গোঁসাইজির ময়লা বস্ত্রও কেচে ধুয়ে পরিষ্কার করেও ছোটদাদুর তেমন লাভ হয় না। কেন না মহিলা শিষ্যদের মধ্যে স্বাস্থ্যবতী অবিবাহিতা বিএ ফেল মহুয়া পিসিকেই গোঁসাইজি পছন্দ করেন এবং কণ্ঠিবদলের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কণ্ঠিবদলের কথায় মহুয়া পিসি ও তার বাড়ির লোকেরা যথেষ্ট রেগে যান। শেষ পর্যন্ত পিসির তিন ষন্ডামার্কা ভাই এসে নাদুসনুদুস গোঁসাইকে বেশ করে কিল ঘুষি দিয়ে দুপুরের বাসে তুলে দিয়ে আসে। এরপরে মুমুক্ষু ছোটদাদুর ভক্তিতে খানিক ভাঁটা পড়েছিল সম্ভবত। এমনতর বিষয়ে তাকে লিপ্ত হতে আর দেখি নি আমরা।

আজকে এতগুলো বছর পরে পেছন ফিরে তাকালে অবাক লাগে, সত্যি চোখের সামনে এতসব ঘটেছে! তবে আরেকটা সত্যও উপলব্ধি করি, ঐকান্তিক ঈশ্বরভক্তি বা সাধক জীবন অনেকই বৃহৎ ও অনন্য বিষয়। লাভের কড়ি গোণার জন্যে নয়, প্রকৃত শান্তিলাভের জন্যে অনন্য চর্চা। তার উদ্দেশ্য অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা। যেমনটি আমরা নিকটজনের মত পেয়েছিলাম মহারাজজিকে, একেবারে বাল্যকালে। যিনি সুপরামর্শ দিয়ে, নিজ সাধনালব্ধ ঐশী শক্তি দিয়ে সবার মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করে গেছেন।

# আন্না মনি

## ভারতের আবহাওয়া কন্যা

**রাখি পুরকায়স্থ**

১৯৪০ সাল। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে গবেষণা করতে এলেন এক পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী। গবেষণার বিষয়— চুনি ও হীরকের বর্ণালী বিক্ষণ। ক্রমে ক্রমে তাঁর পাঁচটি একক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল। পিএইচডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে গবেষণা-সন্দর্ভ জমা দিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হল না! কিন্তু তাতে কি তিনি দমে গেলেন? থেমে কি গেল তাঁর স্বপ্ন পূরণের লড়াই? না, তা কক্ষনো হতে পারে না। কারণ, সেই লড়াকু ছাত্রীটির নাম আন্না মোদায়িল মনি! জীবনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তিনিই একদিন হয়ে উঠলেন 'ভারতের আবহাওয়া কন্যা'!

ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য ট্রাভাংকোরের (বর্তমানে কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি জেলার) পীড়মেডুতে ১৯১৮ সালের ২৩ আগস্ট একটি সমৃদ্ধশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আন্না মনি। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্তম। তাঁর পিতা ছিলেন পুরকৌশলবিদ এবং একটি বিশাল এলাচ বাগানের মালিক। পরিবারটি বংশ পরম্পরায় প্রাচীন সিরীয় খ্রিস্টধর্মের অনুগামী হলেও, আন্নার পিতা আজীবন অজ্ঞেয়বাদী থেকেছেন।

বিংশ শতকের গোড়ার দশকগুলিতে পরাধীন ভারতের সমাজ-স্বীকৃত ধারণা ছিল, সংসার সামলানো

ও সন্তান প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকুই কেবল মেয়েদের প্রদান করা উচিত। আন্না মনির পরিবারের ধ্যানধারণা মোটেই এর ব্যতিক্রম ছিল না। সে-আমলের একটি আদর্শ উচ্চবিত্ত অভিজাত পরিবার বলতে যা বোঝায় মনি পরিবার ছিল তাই। শৈশব থেকেই সে-পরিবারের পুত্র সন্তানদের অতি উচ্চমানের পেশাগত জীবনের জন্যে প্রস্তুত করা হত, অথচ কন্যা সন্তানদের মূলত বিবাহযোগ্যা করে তুলতে প্রয়োজনমত গড়েপিটে নেওয়া হত। সামাজিক ও পারিবারিক গতানুগতিকতার মধ্যে থেকেও শৈশব

*আন্না মনি*

থেকেই আন্না ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্রের। সারাদিন বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকতেন তিনি। আট বছর বয়সের মধ্যে স্থানীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত মালয়ালি বই এবং বারো বছর বয়সের মধ্যে সব ইংরেজি বই তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অষ্টম জন্মদিনে, পারিবারিক প্রথা অনুসারে, হীরের কানের দুল উপহার দেওয়া হলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে আবদার করেন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সব খণ্ডগুলির জন্য। এমনই ছিল তাঁর বইয়ের প্রতি আকর্ষণ। জীবন-প্রারম্ভের এই গঠনমূলক দিনগুলিতে বইয়ের বিশ্ব তাঁর মনের জানালা অবারিত করে দেয়। নতুন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাচেতনার ক্রমপ্রসারিত জগৎ। এই নবলব্ধ জ্ঞানের সুদূর প্রসারী প্রভাব আন্নার ভবিষ্যৎ জীবনকে নবরূপে রূপায়িত করে।

১৯২৪ সালে ট্রাভাংকোর রাজ্য জুড়ে প্রবল গণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। কারণ, ভৈকম শহরে অবস্থিত (বর্তমানে কেরালার কোট্টায়াম জেলার অন্তর্গত) শ্রীমহাদেবা মন্দিরের পুরোহিতেরা ২১জন দলিতকে সেই মন্দির সংলগ্ন রাস্তা ব্যবহার করতে বাধা দিয়েছিলেন। এহেন শ্রেণি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ট্রাভাংকোরের সমস্ত জাতি-বর্গের মানুষ। ক্রমে সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচিতি পায় ঐতিহাসিক ভৈকম সত্যাগ্রহ' নামে। আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে ১৯২৫ সালের ৯ মার্চ ভৈকম শহরে পা রেখেছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। 'মানুষের একজাত, একধর্ম, একদেবতা'— সত্যাগ্রহের এই স্লোগান সাধারণ প্রগতিশীল মানুষের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। তাঁদের দাবি ছিল, শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করবার অনুমতি দিতে হবে। এই আন্দোলনের সময় আন্না ছিলেন নিতান্তই শিশু। তবে এই সত্যাগ্রহ, বিশেষ করে গান্ধীজীর আগমন ও সমর্থন, এবং তার ফলস্বরূপ চারিপাশের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশ, আন্নার জীবনাদর্শকে আগামী দিনে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়, এবং 'পূর্ণ স্বরাজ' স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তখন আন্না ক্রমশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজীবন তিনি কেবল খাদি বস্ত্রই পরিধান করেছেন। শক্তিশালী জাতীয়তাবোধ তাঁকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় চিত্তে লড়াই করতে আগ্রহী করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেন, দেশমাতৃকার মতই দেশের প্রতিটি নারীও পরাধীন। লিঙ্গবৈষম্যের শিকার ভারতীয় নারীদের জীবন অতিবাহিত হয় সমাজ ও পরিবারের ইচ্ছানুসারে। তাই মনের কোণে সযত্নে লালিত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যে তিনি নিজের শর্তে বাঁচবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর দিদিদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কিশোরী বেলাতেই। দিদিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে আন্না যখন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হলেন, তখন তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সক্রিয় বিরোধিতা কিংবা উৎসাহ দান, কোনও

কিছুই দেখা গেল না। সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আন্নার এমত সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর পরিবারের ছিল এক আশ্চর্য ঔদাসীন্য!

আন্না মনি ডাক্তারি পড়তে চেয়েছিলেন। নানান কারণে যখন তা সম্ভব হল না, তখন তিনি পদার্থবিজ্ঞান পড়বেন বলে মনস্থির করেন। কারণ এই বিষয়টিতে তিনি যথেষ্ট ভাল ছিলেন। ভর্তি হলেন মাদ্রাজের (অধুনা চেন্নাই) প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক স্তরে। ১৯৪০ সালে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে সাম্মানিক সহ স্নাতক হন তিনি। সে-বছরই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবার জন্য বৃত্তি লাভ করেন এবং নোবেল জয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সিভি রমনের গবেষণাগারে গবেষণা করবার সুযোগ পান। সেখানে চুনি ও হীরের বর্ণালীবিক্ষণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় লিপ্ত হন আন্না। সে-সময় ত্রিশটিরও বেশি হীরক খন্ডের প্রতিপ্রভা, শোষণ প্রক্রিয়া, রমন বর্ণালী, তাপমাত্রা নির্ভরতা, মেরুকরণের প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণও নথিভুক্ত করেন। সে-সব পরীক্ষানিরীক্ষা ছিল সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। স্ফটিকগুলিকে তরল বায়ু তাপমাত্রায় রাখতে হত। সেই সঙ্গে কিছু হীরের দুর্বল আলোক বিকিরণের জন্য ফটোগ্রাফিক প্লেটে বর্ণালী পরিমাপ ও নথিভুক্ত করতে প্রয়োজন হত কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ ঘণ্টা আলোক-সম্পাত কালের। গবেষণাগারে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘসময় কাজ করতে হত আন্নাকে। কখনও সারাটা রাত গবেষণার কাজে ডুবে থাকতেন, ঘুমিয়েও পড়তেন সেখানেই।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে, হীরে এবং চুনির আলোক বিকিরণ বিষয়ক তাঁর এককভাবে রচিত পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সালের আগস্টে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভটি জমা দেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সে। তখনকার নিয়মানুসারে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে গবেষণা করবার পরে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। দুর্ভাগ্যের কথা, প্রকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আন্না মনিকে কখনওই পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয় নি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তি দেয়, পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকায় আন্না মনিকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে আন্না মনি যে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে সাম্মানিক সহস্নাতক হয়েছিলেন এবং তার ভিত্তিতেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে স্নাতকোত্তর গবেষণা করবার জন্য বৃত্তি পেয়েছিলেন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আশ্চর্যভাবে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়।

আন্না মনির সেই পিএইচডি গবেষণা-সন্দর্ভটি বর্তমানে ব্যাঙ্গালুরুর রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে প্রদর্শিত রয়েছে। দেখে বুঝবার উপায় নেই, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধটি আন্না মনিকে পিএইচডি ডিগ্রি এনে দিতে পারে নি! আত্মবিশ্বাসী আন্না মনি অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ঘটা এমন অন্যায়-অবিচারের প্রতি রাগ, বিদ্বেষ কিংবা অসন্তোষ পোষণ করেন নি। পরিবর্তে বিভিন্ন সময় জোর দিয়ে বলেছেন, পিএইচডি ডিগ্রির অভাব কখনওই তাঁর সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে নি।

পিএইচডি ডিগ্রি থেকে বঞ্চিত হলেও, সেই গবেষণা-সন্দর্ভটির ভিত্তিতে আন্নাকে ইংল্যান্ডে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারি বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি জাহাজে চেপে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যদিও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়াই তাঁর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডে গিয়ে বাধ্য হন লন্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজে আবহাওয়া যন্ত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে। কারণ, সরকারি বৃত্তিতে কেবলমাত্র এই বিষয়টি পড়বারই সুযোগ ছিল। ইংল্যান্ডে আন্না মনি আবহাওয়া যন্ত্রাদির খুঁটিনাটি অধ্যয়ন করেছিলেন, তাদের ক্রমাঙ্কন এবং মান নির্ধারণ পদ্ধতি শিখেছিলেন। এমনকী নিজেও সে-সব যন্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করেছিলেন।

১৯৪৮ সাল। ভারতের স্বাধীনতার বয়স সবে এক বছর। ঠিক এমন সময় স্বদেশে ফিরে এলেন আবহাওয়া যন্ত্র বিশেষজ্ঞ আন্না মনি। যোগ দিলেন পুনেতে অবস্থিত ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের যন্ত্র বিভাগে। ১৯৪৭ সালের আগে থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটারের মত সাধারণ আবহাওয়া নির্ধারক যন্ত্রগুলিও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। কিন্তু স্বাধীনতার পরে, নতুন ভারত গড়বার বাতাবরণে,

তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান এস.পি. ভেঙ্কিটেশ্বরন চেয়েছিলেন, দেশের মধ্যেই আবহাওয়া সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে। সেই ভাবনা থেকেই রেইন-গেজ, ইভ্যাপরিমিটার, থার্মোমিটার, অ্যানিমোমিটার, বাতপতাকা প্রভৃতি সরল যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা শুরু হয়। সেই সঙ্গে থার্মোগ্রাফ, হাইড্রোগ্রাফ প্রভৃতি স্বয়ংলিখ যন্ত্রগুলির উন্নতিবিধান করবার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। আবহাওয়া সংক্রান্ত সরঞ্জামাদির ক্রমাঙ্কন ও নির্মাণে প্রশিক্ষিত আন্না মনি স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবার জন্য আর্দশ মানুষ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। 'স্বদেশী' ভাবনায় উদ্বুদ্ধ গান্ধীবাদী আন্না মনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই আবহাওয়া যন্ত্র নির্মাণে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি যন্ত্র বিভাগের প্রধান হন। সে-আমলে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানব সম্পদের অভাব ছিল। যেটুকু পাওয়া যায়, তা দিয়েই তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে তাঁর অধীনস্থ ১২১ জন পুরুষকে শিখিয়েছিলেন, অপ্রতুল পরিকাঠামোর মাঝেও সর্বোত্তম উপায়ে কাজ করতে। 'কাজ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় খুঁজে বের করতে হবে!'- এই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র।

১৯৫৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে, আন্তর্জাতিক জিওফিজিক্যাল বর্ষ চলাকালীন, আন্না মনি সৌরবিকিরণ পরিমাপের জন্য কয়েকটি স্টেশনের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। ওজোন পরিমাপক যন্ত্র 'ওজোনসোন্ড'-এর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন তিনি। এতে ওজোন স্তরের নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় ভারত। তাঁর এই একক অবদানকে সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক ওজোন অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে সদস্য নির্বাচিত করে। ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক বিক্রম সারাভাইয়ের অনুরোধে, আন্না মনি সফলভাবে ১৯৬৩ সালে কেরালায় অবস্থিত থুম্বারকেট উৎক্ষেপণ ক্ষেত্রে একটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার এবং একটি ইনস্ট্রুমেন্টেশন টাওয়ার স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ব্যাঙ্গালুরুর নন্দী পাহাড়ে স্থাপন করেছিলেন একটি মিলিমিটার-ওয়েভটেলি স্কোপ।

১৯৬৯ সালে তাঁকে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের উপ-মহাপরিচালক হিসেবে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৫ সালে তিনি মিশরে গিয়ে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের উপ-মহাপরিচালকের পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিলেও, তিনি কিন্তু শিক্ষায়তনিক জগৎ থেকে মোটেই অবসর নিলেন না। যোগ দিলেন রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসেবে। সেখানে তিন বছর শিক্ষকতা ও গবেষণায় নিয়োজিত থেকে অসামান্য কর্মকাণ্ডের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন তিনি।

৩০ বছরেরও অধিক সময়কালব্যাপী বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক জীবনে নিরন্তর গবেষণা করে আন্না মনি বায়ুমণ্ডলীয় ওজোন, আবহাওয়া যন্ত্রপাতির জাতীয় মান নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক স্তরে আবহাওয়া যন্ত্রের তুলনা করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত অনেকগুলি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রায় ১০০টি আবহাওয়া যন্ত্রের আঁকাকে স্বীকৃত মান অনুযায়ী প্রমিত করেন। আন্না মনি সৌর বিকিরণ সংক্রান্ত দুটি অত্যন্ত মূল্যবান বই লিখেছিলেন— The Handbook for Solar Radiation Data for India (১৯৮০) এবং Solar Radiation over India (১৯৮১)। বর্তমানে বই দুটি সৌর-তাপীয় ব্যবস্থায় নিযুক্ত প্রকৌশলীদের জন্য আদর্শ পথনির্দেশিকা হয়ে উঠেছে।

ভবিষতদ্রষ্টা আন্না বুঝেছিলেন, ভারতের অগ্রগতিতে বিকল্প শক্তির উৎসগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। ভারতের বায়ুশক্তির সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরে তিনি অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে ৭০০টিরও বেশি স্থানে বায়ুর গতি পরিমাপের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্গালুরুর শিল্প শহরতলিতে, আন্না মনি একটি ছোট্ট সংস্থা শুরু করেন, যেখানে বায়ু ও সৌরশক্তি পরিমাপের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বায়ু ও সৌরশক্তির বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সৌর-প্রবাহ ও বায়ু-চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তিনি আশাবাদী ছিলেন, তাঁর ছোট্ট কারখানায় উৎপাদিত যন্ত্রপাতিগুলি এই তথ্যগুলি

সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উপযোগী হবে। তাই আজ যে সারাদেশ জুড়ে সৌর ও বায়ুখামার স্থাপনে ভারত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বর্তায় আন্না মনির ওপর।

১৯৯১ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার বুলেটিনে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে আন্না বলেছিলেন, 'কোনও কাজ করবার প্রত্যাশা ছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার সবচাইতে বেশি খারাপ লাগে। তবে কাজ শেষ হলে, আমি বই পড়তে ও গান শুনতে ভালবাসি'। এহেন কাজ পাগল আন্না মনি, প্রগাঢ়ভাবে বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি উৎসর্গীকৃত থেকে, বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করেন নি। তিনি প্রকৃতি অনুরাগী ছিলেন, ভালবাসতেন ট্রেকিং ও পাখি পর্যবেক্ষণ।

ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি, আমেরিকান মিটিওরোলজিক্যাল সোসাইটি, ইন্টারন্যাশনাল সোলার এনার্জি সোসাইটি, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সংস্থার সম্মানিত সদস্য ছিলেন আন্না। ১৯৮৭ সালে তিনি আইএনএস একে.আর. রমানাথন পদক লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে পক্ষাঘাতের শিকার হন আন্না মনি, যা তাঁকে বাকি জীবনের জন্যে স্থবির করে দেয়। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে, কর্মতৎপর মানুষটি শেষ জীবনে এসে অক্ষম হয়ে যান। ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট তিরুবনন্তপুরমে তিনি পরলোক গমন করেন। আন্না মনির জন্ম শতবার্ষিকীতে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা তাঁকে স্মরণে করে এবং তাঁর সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি তাঁর জীবনী পরিলেখ প্রকাশ করে।

নিজের জীবন এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে আন্না মনির অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। মাটিতে পা রেখে তিনি আকাশকে ছুঁয়েছিলেন। এমন এক যুগে তিনি পদার্থবিজ্ঞানকে নির্দ্বিধায় আপন করে নিয়েছিলেন, যখন ভারতে মহিলা পদার্থবিদদের সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়। একজন নারী বিজ্ঞানী হিসেবে যে সব সমস্যা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা নিয়ে তিনি সারা জীবন সরব থেকেছেন। বিজ্ঞান-জগতের লিঙ্গ রাজনীতিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। যন্ত্র পরিচালনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নারী বিজ্ঞানীদের সামান্যতম ত্রুটিকেও যেভাবে নারীদের অক্ষমতার নির্দশন হিসাবে প্রচার করা হত, তা তাঁকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। তাই সমাজ নির্মিত বাধ্যতামূলক লিঙ্গ পরিচয়কে তিনি সক্রিয়ভাবে প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এতে নারীদের কর্ম পরিসর সীমাবদ্ধ হয় এবং সাফল্যের সম্ভাবনা কমে যায়; পাশাপাশি পুরুষের চাইতে নারীর বৌদ্ধিক ক্ষমতা কম— এই ভুল ধারণাটি সাধারণ মানুষ 'ধ্রুব সত্য' বলে মেনে নেন।

ভারতের আবহাওয়া কন্যা আন্না মোদায়িল মনির জীবন এমন এক বিজ্ঞান সাধিকার মোক্ষ প্রাপ্তির কাহিনি যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারোর পক্ষেই হয়তাসেই মহান উচ্চতায় পৌঁছে যাপন করা সম্ভবপর নয়। নিজের সীমিত সাংস্কৃতিক পরিসরকে পরম মানসিক বলে অতিক্রম করে, তিনি যে কেবলমাত্র নিজের জন্য একটি স্বাধীন জীবন ও সফল পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন তা-ই নয়, সেই সঙ্গে তৈরি করেছিলেন তাঁর একান্ত নিজস্ব বিজ্ঞান গবেষণা পরিসর। সৃষ্টি করেছিলেন একটি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবহাওয়া নির্ধারক যন্ত্র নির্মাণ কর্মশালা— তাঁর স্বপ্নের ছোট্ট কারখানা! তাঁর ঐকান্তিক গবেষণা কর্মের ফলস্বরূপ ভারতের আবহাওয়া পরিমাপ-পদ্ধতিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে সৌর ও বায়ুশক্তি ব্যবহারের ভিত্তিস্থাপনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে তাই এটুকুই কামনা, ভারত যেন কখনওই তার এই বিস্ময়কর আবহাওয়া কন্যা ও তাঁর দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবদানের কথা বিস্মৃত না হয়।

**আন্না মনি এমন এক যুগে পদার্থবিজ্ঞানকে নির্দ্বিধায় আপন করে নিয়েছিলেন, যখন ভারতে মহিলা পদার্থবিদদের সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়। একজন নারী বিজ্ঞানী হিসেবে যে সব সমস্যা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা নিয়ে তিনি সারা জীবন সরব থেকেছেন।**

## পুরাণের নারী

# কৃকলপত্নী সুকলা

### শাঁওলি দে

পদ্মা মহাপুরাণে সুকলা নামে এক নারীর কথা জানা যায়। তিনি ছিলেন মহা সতী সাধ্বী, ধর্মপ্রাণা, পরিব্রতা এক নারী। বারাণসীধামে কৃকল নামে এক বৈশ্য বাস করতেন। সুকলা ছিলেন তাঁরই পত্নী।

কৃকল নিজেও ছিলেন জ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি। নিয়মিত পুরাণ পাঠ করতেন তিনি। পুরাণ পড়েই তিনি জানতে পারেন, 'তীর্থযাত্রায় বহুপুণ্য'। এরপর তিনি কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় যাবেন বলে মনস্থ করেন। স্বামীর তীর্থযাত্রার কথা শুনে সুকলাও তাঁর সঙ্গে তীর্থে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্বামীকে জানান স্ত্রী সবসময়ই স্বামীর অনুগামিনী হয়। এছাড়াও তিনি মনে করেন স্বামীই হচ্ছে সর্বতীর্থময় এবং সর্বপুণ্যময়। নারীর পতিসেবা ছাড়া আর অন্য কোনও ধর্ম নেই। একমাত্র পতিপরায়ণা নারীই হয় পুণ্যবতী। সুতরাং যে কোনও উপায়েই স্বামীর সঙ্গে তাঁর তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া উচিত।

কৃকল স্ত্রীর সব কথা শুনলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবলেন সুকলা সুন্দরী, অল্প বয়সী। তীর্থক্ষেত্রের কঠিন পথ সে কি আদৌ পার করতে পারবে? তাছাড়াও রয়েছে পথের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের বিপদ, খারাপ মানুষ, শীত, বর্ষার মত ঋতু। খিদে তৃষ্ণাই বা সে সহ্য করবে কেমন করে? এইসব নানা কথা চিন্তা করে কৃকল রাতের অন্ধকারে স্ত্রীকে না জানিয়েই তীর্থে রওনা দিলেন কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে।

পরদিন সকালে সুকলা স্বামীকে দেখতে না পেয়ে খুব দুঃখ পেলেন। বেলা গড়িয়ে গেলেও স্বামীকে ফিরতে না দেখে তিনি বুঝতে পারলেন কৃকল ঠিক তীর্থেই গিয়েছেন। সুকলা তখন মনে মনে এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বামী গৃহে ফেরত না আসা অবধি তিনি মাটিতেই শোবেন, ত্যাগ করবেন পার্থিব সবরকম সুখ। সেই সিদ্ধান্ত মত সুকলা ঘি, তেল, দই, ক্ষীর, লবণ ও পান ত্যাগ করলেন। দিনে একবার মাত্র আহার করতে শুরু করলেন। সারাদিন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। তাঁর সোনার অঙ্গ হল মলিন।

সুকলার এমন দশা দেখে তাঁর সখীরা সবাই দুঃখ পেলেন। তাঁরা সুকলার গৃহে এসে তাঁকে নানারকম ভাবে বোঝাতে লাগলেন। যে স্বামী স্ত্রীকে না জানিয়ে, তাকে না নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যান তাঁর জন্য এত বড় ত্যাগ করে কী লাভ? এছাড়াও এই জগতে কে কার? তাই সুকলার উচিত সব সুখ ত্যাগ না করা।

সখীদের কথা শুনে খুবই হতাশ হলেন সুকলা। তিনি বললেন, প্রকৃত পতিব্রতা নারী কখনই এমনভাবে ভাবে না। স্ত্রীর উচিত স্বামীর কাছে থেকে সবসময় তাঁর সেবা করা। নারীর এই রূপ, যৌবন সবকিছুই স্বামীর জন্য। একমাত্র স্বামীকে তুষ্ট করতে পারলেই সব দেবতারা তুষ্ট হন। তাই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করলেও সুকলা তাঁকে ত্যাগ করতে পারবে না। যতদিন না পর্যন্ত স্বামী ফিরে আসেন ততদিন পর্যন্ত স্বামীর চরণ ধ্যান করবেন তিনি। এটাই তাঁর মত পতিব্রতা নারীর একমাত্র করণীয়। এই কথা জানার পর সুকলা সখীরা তাঁর খুব প্রশংসা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেবরাজ ইন্দ্রের কানেও

এসে পৌঁছাল সুকলা কথা। তিনি তখন মনে মনে চিন্তা করলেন সুকলার মত ধর্মপ্রাণা রমণী জগতে কমই আছে। তাই তিনি সুকলাকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্থির করলেন যেমন করেই হোক এর পতিপ্রেম ও ধর্ম বিনষ্ট করতেই হবে।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা চিন্তা করে রতিপতি মদনকে ডেকে বললেন, যেমন করেই হোক সুকলা নামের এই নারীকে বশীভূত করতেই হবে। মদন তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন। কত মুনি, ঋষি দেবতাকে মদন খুব সহজেই বশ করেছেন তাঁর কামবাণে, সেখানে এই নারীকে বশ করা কোনও ব্যাপারই নয়। খুব তাড়াতাড়িই তিনি সুকলাকে বশ করে ইন্দ্রের কাছে এনে দেবেন।

ইন্দ্র হাসলেন। মদনদেবকে সাবধান করে জানালেন, এই নারীকে শুধু কৌতুকবশতই বিচলিত করতে হবে। কারণ ইন্দ্র জানতে চান এই নারী পতির প্রতি ধর্ম পালন করতে কতদূর যান এবং এটা দেখাই ইন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য, এর পেছনে কোনও কাম, লোভ বা রাগের কারণ নেই।

কামদেব সব শুনে সুন্দর রূপের পুরুষ সেজে সুকলার কাছে গেলেন। নানা ছলাকলায় তাঁকে নিজের কাছে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পতির ধর্মে অবিচল সুকলা তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। মদনদেব ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে ইন্দ্র এক দূতীকে সুকলার কাছে পাঠালেন।

দূতী সুকলার কাছে গিয়ে বললেন, ‘তোমার মত রূপবতী নারী আমি আর দেখি নি। তুমি কার ভার্য্যা? তোমার স্বামী কোথায়?’

সুকলা জানালেন তিন বছর হল তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে তীর্থে চলে গিয়েছেন। কোনও খোঁজও পান নি। তাই সুকলা স্বামীর প্রতীক্ষা করছেন, স্বামীর চরণ কল্পনা করে ধ্যান করছেন। ত্যাগ করেছেন সমস্ত পার্থিব সুখ। সুকলার কথা শুনে দূতী অবাক হলেন। বাধ্য হয়েই তিনি সব সত্যি কথাই সুকলাকে জানালেন। এর সঙ্গে আরও বললেন, নিশ্চয়ই তাঁর স্বামী মহাপাপী, নইলে এমন স্ত্রীকে ছেড়ে কেউ যায়? কিম্বা হয়ত তিনি আর বেঁচেই নেই। যৌবনকাল হল সুখ ভোগের একমাত্র উপযুক্ত সময়। তাই সুকলার উচিত এমন যৌবন বৃথা নষ্ট না করে অন্য কারও সঙ্গে সেতুবন্ধন করা। সুকলার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন এক স্নেহময় সুপুরুষ। সুকলার উচিত এই শোক ত্যাগ করে সেই পুরুষের সঙ্গে গমন করা।

দূতীর সব কথা শুনেও সুকলা নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। বললেন, জীব হল স্বয়ংসিদ্ধ, অমর। তার কোনও বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য নেই। দেহের বিনাশের পর নতুন দেহের রূপ পায়। আত্মা একই রকম স্থির, নিশ্চল থাকে।

দূতীর মুখে সুকলার এইসব কথা শুনে ইন্দ্র অবাক হলেন। তিনি মদনদেবকে সঙ্গী করে আরও অনেক চেষ্টা করলেন সুকলার মন গলানোর। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হলেন। এমন ধর্মজ্ঞান ও ধৈর্যশীলতা আর কোনও নারীর মধ্যে তিনি আগে কখনও দেখেন নি। মুগ্ধ হয়ে তিনি মদনদেবকে বললেন, এমন নারীকে জয় করার ক্ষমতা কারও নেই, স্বয়ং মদনদেবেরও নয়। তাই মদনদেবের উচিত সুকলার চিন্তা ছেড়ে অন্য কাজে মন দেওয়া। কিন্তু মদনদেব রাজি হলেন না। এই নারীর কাছে হার মানা মানে নিজের কীর্তি নাশ করা। এই সামান্য নারীর কাছে হারলে তাঁর এতদিনের কাজের যোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে, তাই এই নারীকে বশ না করা পর্যন্ত তিনি কোথাও যাবেন না। ইন্দ্র তাঁকে বোঝালেন, এই সতীর সঙ্গে বিরোধে গেলে মদন পরের জন্মে কুৎসিত যোনিতে জন্মলাভ করবেন। তবু মদনদেব স্বীকার করলেন না। ইন্দ্রের কথা অগ্রাহ্য করে তিনি

**ইন্দ্রবেশে কামদেব সুকলার কাছে এসে তাঁর ভজনা করতে চাইলেন। সুকলা তাঁকে চিনলেনও না। জানালেন, তাঁর কর্ম সাধনেই তিনি ব্যস্ত, অন্য কারও দিকে চোখ তুলে তাকানোরই সময় নেই। উপরন্তু অন্য কেউ যদি তাঁর ক্ষতি করে তবে তাঁর মরণ নিশ্চিত। তিনি ধর্মে অবিচল, স্বয়ং কামদেবও তাঁর চিত্ত চঞ্চল করতে পারবে না।**

রতি ও প্রীতিকে পাঠালেন সুকলার কাছে।

রতি ও প্রীতিও সুকলার কাছে গিয়ে নানাভাবে সুকলাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বিষিয়ে তুলতে চাইলেন স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর মন। কিন্তু সুকলা অবিচল। তাঁর ওই এক কথা। পত্নীর কাজ হল স্বামীর পদ অনুসরণ করা। স্বামীর পাকে পুষ্কররূপে কল্পনা করে তা প্রদক্ষিণ করা। স্বামী সঙ্গ করলে তা তীর্থ ভ্রমণের সমান। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বামীর সঙ্গে যেতে পারে ননি, তাই অপেক্ষাই হবে তাঁর একমাত্র কাজ। স্বামীহীন তাঁর দেহ এই মুহূর্তে নিরাশ্রয়। স্বামী তাঁকে ত্যাগ করলেও তাঁর দেহ ও মন দুটোই আছে স্বামীর কাছে।

রতি ও প্রীতি এই কথা শুনে লজ্জিত হলেন। নারী হিসেবে নিজেদের সুকলার কাছে খুব ছোট মনে হল। কামকে তাঁরা নিজের পুরুষ অভিমান ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু কাম তো দমবার পাত্র নন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে সুকলাকে কামবাণে আহত করতে চাইলেন। সুপুরুষ ইন্দ্রকে দেখে কামনার উদ্রেক হয় নি এমন নারী পাওয়া ভার।

এরপর ইন্দ্রবেশে কামদেব সুকলার কাছে এসে তাঁর ভজনা করতে চাইলেন। সুকলা তাঁকে চিনলেনও না। জানালেন, তাঁর কর্ম সাধনেই তিনি ব্যস্ত, অন্য কারও দিকে চোখ তুলে তাকানোরই সময় নেই। উপরন্তু অন্য কেউ যদি তাঁর ক্ষতি করে তবে তাঁর মরণ নিশ্চিত। কারণ তাঁকে রক্ষা করে ধৃত, মতি, গতি, বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মপরিজন। তিনি ধর্মে অবিচল, স্বয়ং কামদেবও তাঁর চিত্ত চঞ্চল করতে পারবে না। তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করলে সত্যের তেজে এখনই সেই পুরুষ দগ্ধ হবে।

কামদেব এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। যে নারী সতী, তাঁর পবিত্রতা রক্ষা করার মত স্পর্ধা নেই কারও। ইন্দ্রের আদেশে তিনি সুকলার পথ ত্যাগ করলেন। আর সুকলা বহু বছর অপেক্ষার পর তাঁর স্বামী কৃকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। যদিও কৃকল নিজেও প্রিয়তমা স্ত্রীকে ত্যাগ করার ফলে তীর্থ করার পুণ্য অর্জন করতে পারেন নি।

এইভাবেই নিজের সতীত্বরক্ষার জন্য সুকলার নিষ্ঠা ও ধ্যান পুরাণে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

# কেবল পুরুষ নয়, নারীরও কর্তব্য অন্য নারীকে যথাযথ সম্মান করা

গত ৮ই মার্চ ছিল বিশ্ব নারী দিবস। আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি তাতে হয়ত মনে হতেই পারে আলাদা করে নারী দিবস পালন করার কোনও দরকার নেই। কিন্তু নারীদের প্রতি সম্মান জানাতে যদি বিশেষ কোনও দিন পালিত হয় তাহলে অসুবিধা কোথায়! ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে সমাজ নারীকে সম্মান করে সেই সমাজ অনেক বেশি উন্নত। তবে নারীবাদ মানেই পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়। নারীদেরও সবার আগে অন্য নারীকে যথাযথ সম্মান করতে শেখা উচিত। আর সেখানেই নারীজাতির প্রকৃত জয়। প্রতিটি নারী যখন আরেকটি নারীর প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠবে তখন প্রত্যেকটি দিবসই নারী দিবস।

তাই কোনও পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়, আমি তো বলব তাদের সঙ্গে একসাথে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে চলা ও সঠিক বন্ধুত্বের অঙ্গীকার একজন প্রকৃত নারীর কাজ। আর নিজের সন্তানটিকে সবার আগে শেখানো কীভাবে একজন নারীকে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে হয়। আমাদের সম্মান বা অধিকার রক্ষা করার জন্য আলাদা করে চিৎকার করবার দরকারই পড়বে না যদি আপনি আমি ছোট থেকেই আমাদের সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিই।

আমার নারী বন্ধুদের বলি নিজেকে কখনও ছোট ভাববে না। সবসময়ই সফলতা আসবে এমন নয় কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি কী। আগে থেকেই হাল ছেড়ো না মেয়ে। আমরা সৃষ্টি করতে পারি, আমরাই তো মূল চালিকাশক্তি। নিজেকে সবসময় পজিটিভ রাখার চেষ্টা করতে হবে। ভাল থাকতে হবে। সব নারীদের এক সাথে হাতে হাত ধরে চলতে হবে।

## পয়লা বোশেখে বাড়িতে বানান মুচমুচে মিঠে গোকুল পিঠে

প্রায় সবার বাড়িতেই গোকুল পিঠে তৈরি করে থাকেন বাড়ির মা কাকিমারা, কিন্তু আমার এই গোকুল পিঠের রেসিপিটা খানিকটা অন্যরকম। আমি অন্তত আমার মা ছাড়া এইভাবে গোকুল পিঠে কাউকে বানাতে দেখি নি। এটি আমার মায়ের স্পেশাল রেসিপি। প্রস্তুতির মত কিছুটা সময় থাকলে এটি একবার বানিয়ে দেখবেন।

নারকোল কুড়ে তার সঙ্গে খোয়া ক্ষীর মিশিয়ে চিনি আর নলেন গুড় মিশিয়ে আগে থেকেই পুর বানিয়ে নিতে হবে। এটি বানিয়ে রাখাই যায়। শীতের সময় ফ্রিজের বাইরেও বেশ ক'দিন থেকে যাবে। নয়তো ফ্রিজে রেখে দিন। ময়দা পরিমাণ মত নিয়ে তাতে ঘি দিয়ে ভাল করে ময়ান দিতে হবে। একবারে ময়দা মুঠোয় করে নিলে দলা হয়ে থাকে এভাবে ময়ান দিতে হবে। তারপর দুধ দিয়ে এই ময়দা গুলে ব্যাটার বানাতে হবে। এক চিমটি নুনও দিয়ে দিতে হবে। ব্যাটারে কোনও দলা যাতে না থাকে সেটা দেখে নিতে হবে। তারপর সারারাত ব্যাটারের পাত্রটি ঢেকে নরমাল রুম টেম্পারেচারে রাখুন।

সকালে পিঠে ভাজার আগে ব্যাটারে হাল্ফ চামচ বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিতে হবে ভাল করে। বানানোর সময় নারকোলের ক্ষীরসা বা পুরের থেকে হাতের তালুতে সামান্য সামান্য করে নিয়ে চ্যাপটা আকারের পছন্দ মত মাপের বানিয়ে আলুর চপের মত ব্যাটারে চুবিয়ে ভেজে তুলতে হবে ছাঁকা তেলে।

ভাজা পিঠে একটি থালায় ছড়িয়ে রাখতে হবে।

এবার এক দু কাপ চিনি অর্ধেক কাপ জল দিয়ে জ্বাল দিতে হবে যতক্ষণ না চিনির সিরাতে বা রসে তার আসে। আঙ্গুলে ধরে খুব সাবধানে দেখে নিতে হবে সিরাটা চটচটে হয়েছে কিনা।

তারপর ভাজা পিঠে সিরাতে দিয়ে আঁশাতে হবে। সাদা আর মচমচে হয়ে যাবে মুহূর্তেই।

যে ভাবে গজা বানায় বা মুগের পুলি সেভাবেই অনেকটা।

বাইরেটা মুচমুচে আর ভেতরে রসালো। একবার সঠিক বানাতে পারলে আপনি এই পিঠের দৌলতে মিষ্টিপ্রেমীদের মন জয় করে নিতে পারবেন নির্ঘাত।

**পাতা মিত্র**

প্রবাসী কন্যার মেয়েবেলা। ৩

# আটলান্টার বাগানেও ফোটাতে চাই টগর কাঠগোলাপ ঝুমকোলতা

## চৈতালী দে

O Wind, If Winter comes– can Spring be far behind?

ইংরেজী সাহিত্যে কীট আমার প্রিয় কবি হলেও, শেলির লেখা এই পংক্তিটি ভীষণ ভাবে আমার মনের কাছের। নানা সময়ে নানা জায়গায় আমি এই পংক্তিটি ব্যবহার করেছি। কত গভীর মানে লুকিয়ে রয়েছে এই ক'টি শব্দের মাঝে। সত্যিই তো, শীত যদি আসে, বসন্ত কী না এসে পারে! নানা সময়ে, বিভিন্ন কবির লেখায় বসন্তের নানা রূপ ফুটে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আচ্ছা, বসন্ত কার ভাল লাগে না বলতে পারেন? উদাসী বাউল কবি থেকে শুরু করে সদ্য গোঁফের রেখা ফুটে ওঠা কিশোর, বসন্ত দোলা দেয় সবাইকে। শীতের রুক্ষ-শুষ্কতার পর ধীরে ধীরে প্রকৃতি যখন সেজে ওঠে নানা ফুলের বাহারে, তখন চোখ আর মনের এক পরম শান্তি সহাবস্থান করে।

আমার কাছে বসন্ত মানে হল হলুদ পাখি, ফুলের বাগান আর নানা রঙের বাহার আমাদের পুরো বাড়িটা জুড়ে। গাছে আমের মুকুল, টোপা কুল আর বাড়ির পেছন দিকে বড়সড় একটা ঝুমকোলতার ঝোপ। ছোটবেলায় একটু বুঝতে শেখার পর দেখেছি দিদার বাগান করার শখ। দিদা যেখানেই যেতেন, ফেরার সময় আর কিছু না হোক গুটি কতক ফুলের চারা আনতেন। আর পরম যত্নে তা পুঁতে দিতেন ফুলের টবে বা বাগানের এক প্রান্তে। আমার কাজ ছিল রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই চারা গাছটির সামনে দাঁড়ানো আর বিস্ময়ে অবাক চোখে রোজ তার একটু একটু করে বেড়ে ওঠাকে পর্যবেক্ষণ করা। ছোটবেলার সেই অবাক বিস্ময় আমার বালিকা বেলায় এসে পরিণত হল গভীর ভালবাসায়।

কাছেই ছিল ছোটদের খেলার উদ্যান, পার্ক রোডের উপর। তখন অবশ্য পার্ক রোডের এত নাম ডাক ছিল না। আর বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে শহরের সেই সময়কার আমার জানা সব চেয়ে বড় নর্দমা পর্যন্ত সোজা চলে যাওয়া সেই রাস্তার তখন এত গাল ভরা নামও ছিল না। উদ্যানটি ছিল বেশ ছিমছাম আর নানা রকম ফুল গাছ দিয়ে সাজানো। স্কুল থেকে ফিরে মাঝে মাঝেই সেখানে খেলতে যেতাম। সঙ্গী দাদু, কখনও বা দিদা। সেইসময় একজন বয়স্ক ব্যক্তি উদ্যানটির দেখাশোনা করতেন যাকে আমরা ছোটরা পার্ক-দাদু বলে ডাকতাম। একদিন দিদার সাথে পার্কে গিয়ে দেখি পার্ক-দাদু বাগানে কাজ করছেন। দাদুর কাছে চাইতেই উনি কয়েকটি দোলনচাঁপার চারা আমাদের দিলেন। বিশ্ব জয়ের আনন্দ মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরে চারা পোঁতা হল। কালক্রমে সেই চারা বেড়ে আরও ডালপালা বিস্তার করে বেশ বড় একটা ঝোপের আকার নিয়েছিল। আর তা পরবর্তীতে আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে শহরের আরও কিছু বাড়িতে শোভা পেয়েছিল। এই সুদূর আটলান্টাতেও এক দিদির কৃপায় গ্রীষ্মকালে আমার বাড়ির বাগানেও দোলনচাঁপা ফোটে ঠিক যেভাবে ফোটে স্থলপদ্ম, কুন্দ, বেলী আর শিউলি ফুল।

বসন্তকাল নিয়ে লিখব আর সরস্বতী পূজা সেখানে থাকবে না তা কী করে হয়! পূজার দিন ছোট বড় হলদে প্রজাপতির ঝাঁকে আমিও সামিল ছিলাম। সকাল সকাল বাড়ির পুজো শেষ হলেই হলদে শাড়িতে সেজেগুজে আমার প্রিয় কিন্ডারগার্টেনে পৌঁছে যেতাম। সেখানে আর এক প্রস্থ পুজো, অঞ্জলি আর প্রসাদ গ্রহণের পর চলত দু'হাতে শাড়ি পায়ের

গোড়ালির ওপর তুলে বন্ধুদের সাথে হুটোপুটি। তারপর যথারীতি শাড়ির কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বাড়িতে ফিরতাম। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত সরস্বতী পুজো মানে হল আমার হাইস্কুলের পুজো, যেই স্কুল আবার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। বন্ধুরা মিলে সেজেগুজে শাড়ি পরে দল বেঁধে রাস্তা জুড়ে কিচিরমিচির করতে করতে স্কুলে যাবার আনন্দই আলাদা ছিল। তখন আমরা সব হলুদ প্রজাপতি। যেখানে গলিপথগুলো বড় রাস্তার ধারে এসে মিলেছে, সেখানে অপেক্ষায় থাকতো আরও কিছু হলুদ প্রজাপতি। তারপর জুড়ে যেত বাকি দলটার সাথে। সদ্য গোঁফ গজানো কেউ কেউ হয়ত তখন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত সেই দলটার দিকে, অথবা কোনও এক বিশেষ প্রজাপতির দিকে।

সে সময় শহরে বেশ বিরাট করে পুষ্প প্রদর্শনী হত। প্রদর্শনীতে শহর ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতেন। আমরাও আমাদের ফুল-পাতাবাহার-টেবিল-ফুলদানির পসরা নিয়ে পৌঁছে যেতাম যোগদান করতে। সেখানেই প্রথম দেখেছিলাম টবের ছোট্ট গাছের মধ্যে ততধিক ছোট্ট ছোট্ট কমলালেবু ঝুলে আছে। অথবা দানবাকৃতির হরেক রকমের সব্জি। সেই প্রথম জানলাম প্যানসি, পিটুনিয়া, ডিয়াস্থাস, ক্রোটন এমন হাজারো চেনা ফুল আর পাতাবাহারের অচেনা নাম। ফুলের প্রতি ভালবাসা আর বাগান করার ঝোঁক আমার আরও বেড়ে গেল। তারপর থেকে যেখানেই যেতাম, সুযোগ পেলেই দিদার মত ফুল, গাছপালা সংগ্রহ করতাম। সেই অভ্যেস আজ এতগুলো বছর পেরিয়েও সমানভাবে রয়ে গেছে। বাড়ির আনাচকানাচ ভরে তুলেছি নানা ফুল আর পাতার সজ্জায়। তবুও মনে হয় এখনও তো কত কিছু বাকি! আমার ছেলেবেলার সেই টগর, কাঠগোলাপ, ঝুমকোলতা! খোঁজ নিয়ে রেখেছি, এই সুদূর আমেরিকাতেও কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে রয়েছে আমার সাধ পূরণের চাবিকাঠি। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে চুপি চুপি দিদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, এবারের বসন্তে আমার বাগানে শোভা পাবে দুধ-সাদা টগর, হলদে আভার কাঠগোলাপ আর গোলাপি-লাল ঝুমকোলতা।

ডুয়ার্স ইত্যাদি। হরেক মাল দশ টাকা

# কাচের দেওয়াল

## দেবায়ন চৌধুরী

বুথ বলতে ভোট, আর টেলিফোন। আমাদের ল্যান্ডলাইন ছিল না। তুষার কাকুদের ছিল। তারাই আমাদের ডেকে দিত। ছুট ছুট। ডিমের কুসুম পাতে। হলদে হাতে কলতলা পেরিয়ে, আমবাগানের মুকুল গন্ধে ফোন বাড়ি। রিসিভার ধরে থাকলে সেই ডাক আর দশ মিনিট পরে করবে সেই ডাক আলাদা করতে পারতাম। ফোন রিসিভ করা যায় কিন্তু... ফোন করতে বাধোবাধো ঠেকতো। চলার পথে এগরোলের মতোই গজিয়ে উঠল মুস্কিল আসান টেলিফোন বুথ। ঘরের মধ্যে ঘর বলতে মশারি আর এই বুথ। রাত ন-টার পর লম্বা লাইন। একজন তিনটের বেশি ফোন করতে পারবেন না একবারে এই সময়ে। বেশি লাইন হলে সময় বরাদ্দ হত। কাচের বাক্সে মানুষটি। মিটার উঠছে। আমাদের শহরে ট্যাক্সি ছিল না। মিটার বলতে ইলেকট্রিকের আর ফোনের। আমাদের এসটিডি, আইএসডি-র পুরোটা মুখস্থ ছিল। প্রশ্নমঞ্চের প্রশ্ন থাকত যে!

আমার এক বন্ধুর কথা মনে আছে, যার জন্য মালিক আলাদা একটা চেম্বারের ব্যবস্থা করেছিল। সারা দুপুর ওরা কথা বলত। মোবাইল আসার আগেই মিসডকল শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কেউ কেউ কি বুথে ফোন রিসিভ করিনি? বুথ মালিকের বিরক্তি গোঁফের ফাঁকে হাসি হয়ে গলে যায়নি কখনও?

সেই বুথটি এখন উঠে গেছে। খটাং খটাং ইন্ডিকমকেও টাটা দেখিয়েছি আমরা। বুকের মাঝে মোবাইল ফোন অনেক অপেক্ষা আর বিস্ময়কে বালিশের নিচে চাপা দিয়েছে। কাচের বাক্সগুলোয় ধুলোর পাহাড়। মাঝের লাল দাগটি অনেক রক্তক্ষরণের সাক্ষী। ধুলোর বুকে নামের যোগচিহ্নে সেই বন্ধু আর বন্ধুনী এখন কেমন আছে কে জানে!

EKHON DUARS, Vol-8, Issue-1 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

# বরফের খোঁজে চলুন সিল্ক রুট রেশম পথে

**Package Date 13 April 2021**

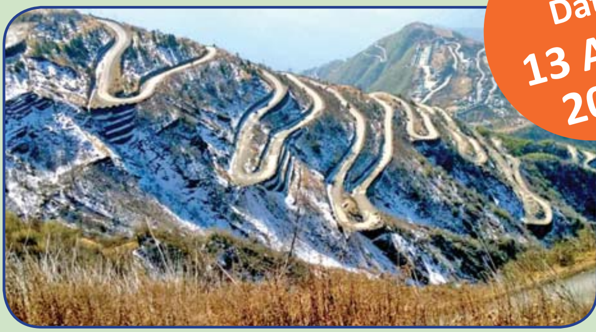

**Silk Route Tour (2 Nights 3 days) NJP to NJP**

**Day 1:** Siliguri to Aritor/Lingtham. O/N stay Aritar /Lingtham /Padamchen. (Time start from Siliguri – Morning 7.30 AM)

**Day 2:** Early morning proceed to Silk route, Padamchen, Kue khola falls, Juluk, Zig Zag View point, old baba mandir, Langthu, Kupup lake (Subject to weather condition) O/N at Aritor / Lingtham/ Padamchen

**Day 3:** After breakfast proceed to NJP On the way visit Aritar Lake. Tour End.

**Package Cost for 9 adult:-**

Rs. 6100/- per head Adult
Rs. 5300/- per Head(Third person)
Rs. 4300/- (5yrs to below 11yrs)
Rs. 2300/- (2yrs to Below 5yrs)

**Note:** Permit charge 200/- Per head extra

**Payment condition:** Per head Rs 1000/- for booking and balance payment 5 days before tour.

**Tour package include:** (1) 01 Sumo or Mahindra Max, (2) Family wise room, (3) All Foods (Per Head 02 Breakfast, 02 Lunch, 02 Evening Tea, 02. Dinner)

## HOLiDAYAAR

TRAVEL BOOKS & BOOKING

Ashirbad Aptt. (Beside Aajkaal Office. 2 min walk from Anjali Jewellers),
P Chaki Sarani Bye lane, Ashrampara, Siliguri 734001, Phone 9434042969, 9002772928
Whatsapp: 9434442866, Mail: holidayaar.nb@gmail.com

## সাতজন হলেই সিল্ক রুটে আপনার পছন্দের যে কোনও দিন

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.